গোমস্তাগিরি ছাড়িয়া স্বয়ং তেজারতি ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে এবং যদু বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিয়াছে ও বিবাহের বৎসরেই তাহার শ্যালক মাণিকের সহযোগে একত্রে 'মণ্ডল ক্ষত্রিয়-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নববধূর সহিত প্রেমালাপ করিয়া যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকিত, তাহা সে সমাজের সেবায় ব্যয় করিত, কাজেই অন্য কাজ করিবার তাহার অবকাশ ছিল না। কদাচিৎ উদাসীকে খেলিতে দেখিলে সে তিরস্কার করিয়া তাহার স্ত্রীর কাছে পড়িতে পাঠাইত— এই প্রকারে উদাসী ষোল বৎসর বয়সে 'শিশুবোধ' শেষ করিল।

সেবার আশ্বিনে 'মণ্ডল ক্ষত্রিয়-সমাজের' বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মণ্ডলপুর গ্রাম উৎসব-কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। অধিবেশন দিবসের একমাস পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন চলিতেছিল। গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের সহিত উদাসীও লাল কাগজের ফুল তৈয়ারীর কাজে লাগিয়া গেল। একদিন প্রভাতে দেবদারুপাতা ও লাল কাগজের ফুলে ঢাকা গ্রাম্যপথ দিয়া কলিকাতার নিমন্ত্রিত বক্তারা মধু মণ্ডলের বাহিরের বৈঠকখানায় পৌছিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে আসিল যদুর বন্ধু ললিত। ললিত পড়িত কলেজে এবং সভা-সমিতিতে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইত; প্রয়োজন হইলে বাবরী দোলাইয়া বক্তৃতাও করিত। এই কারণে দেশের সকল প্রকার নেতার নিকটে ললিতের বেশ সমাদর ছিল।

অধিবেশন শেষ হইয়া গেল এবং 'সুপ্ত মণ্ডল-সমাজের চেতনা-সঞ্চার' করিয়া বক্তারা পরের দিন কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। যদুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ললিত রহিয়া গেল। যদুর অনেকদিনের

ইচ্ছা ছিল, স্ত্রীকে গান শিখাইবে। এই উদ্দেশ্যে সে বরাভরণের অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে শ্বশুরের নিকট হইতে একটি হার্ম্মোনিয়ামও আদায় করিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেটাকে কাজে লাগাইতে পারে নাই। এইবার সুযোগ ঘটিল। মধু মণ্ডল যদুর প্রস্তাবে মিহি রকমের একটু আপত্তি জানাইল, কিন্তু তাহা টিকিল না, অগত্যা বুড়া সুদ আদায় করিতে খাতা বগলে করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া ভিন্ গ্রামে চলিয়া গেল।

বুড়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু ছাত্রী বাহিরে আসিতে রাজী হইল না। তখন যদু উদাসীকে টানিয়া আনিল; বিশ্বাস ছিল একজন কেহ শিখিতে আরম্ভ করিলেই অপর ছাত্রীটিও আসিবে। উদাসী প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু মা কহিল, "ঘরের মেয়ে তোর লজ্জা কিসের? সহরের বড় মানুষের ছেলে গরজ ক'রে শেখাতে চাইছে, এ তো ভাগ্যি!" অতএব ভাগ্যবতী উদাসী নতশিরে জড়সড় হইয়া শিক্ষকের সম্মুখে আসিয়া বসিল। ললিত মুহূর্ত্তের জন্য ছাত্রীটির সমস্ত দেহে একবার চোখ বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি গান শিখবে?"

উদাসী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ললিত কহিল, "একটা গাও তো, যা পার।"

উদাসী কোনো মতে কহিল, "কিছু পারিনে।"

ললিত কহিল, "আচ্ছা, আমি গাই তুমি আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে যাও।" বলিয়া সে গান ধরিল কিন্তু অনেক যত্নেও উদাসীর কণ্ঠে সুর ফুটিল না। ললিত গাহিয়া চলিল; উদাসীর মনে হইতে

লাগিল ললিতের গানের সুর যেন একটা বন্ধনপাশের মত তাহার দেহ-মনকে বাঁধিয়া ফেলিতেছে! যখন গান শেষ হইল তখনও উদাসী নড়িল না। ললিতের কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। ললিত প্রশ্ন করিল, "তুমি এমনি গাইতে পার্ব্বে?"

উদাসী ললিতের দিকে না চাহিয়াই কহিল, "শিখ্‌লে পার্ব্ব।"

যদু কহিল, "যেদিন তুই বাজানো শিখ্‌বি, সেদিন তোকে একটা নতুন বাজনা কিনে দেব।"

উদাসী খুসী হইয়া চলিয়া গেল। নূতন বাজনার লোভে অথবা যে কারণেই হোক্ পরদিন উদাসীকে গান শিখিতে যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। দুই তিন দিনের মধ্যেই সে নিঃসঙ্কোচে ললিতের সঙ্গে সমানে সুর মিলাইয়া গান গাহিতে শিখিল। মা কহিল, "আবাগীর এত গুণ কিছুই কাজে লাগ্‌ল না, কপাল!" যদু, স্ত্রী কুমুদিনীর দিকে একটি বক্র-কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "উদাসীর বাঁ-পায়ের গুণ এ বাড়ীতে কারো নেই।"

প্রথমে সঙ্কোচের বাঁধ যখন ভাঙ্গিল তখন আর উদাসীকে আয়ত্ত করিতে ললিতের বেগ পাইতে হইল না। চাবি টিপিতে শিখাইবার অছিলায় সে উদাসীর আঙ্গুল টিপিয়া দেয়, উদাসী আগেকার মত সসম্ভ্রমে হাত টানিয়া লয় না, সুরের কোমল তুলিতে শিখাইতে গিয়া সে উদাসীর মুখের কাছে মুখ লইয়া যায়, তাহার নিশ্বাস উদাসীর ঠোঁটে লাগে, উদাসীর শরীর কেমন যেন অবশ হইয়া আসে—তবু মুখ সরাইয়া লইতে ইচ্ছা করে না।

পূজা কাটিয়া গেছে। কোজাগরের রাত্রি; ললিত বিছানায়

বসিয়া বাহিরে যেখানে ঘনপত্র তেঁতুলের ছায়ায় জ্যোৎস্নার টুক্‌রা-গুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সেইদিকে চাহিয়াছিল ; উদাসী থালায় করিয়া কতকগুলি নারিকেলের নাড়ু আনিয়া থালাখানি সশব্দে ললিতের বিছানার উপর রাখিয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। ললিত মুখ তুলিয়া কহিল, "চল্‌লে ?"

উদাসী মুখ ফিরাইল।

ললিত কহিল, "কাল আমি চলে যাচ্ছি।"

উদাসী চমকিয়া উঠিল, মনে হইল—এই লোকটা চলিয়া গেলে তাহার যেন আর করিবার কিছু থাকিবে না। উদাসীর বিহ্বল ভাব ললিত লক্ষ্য করিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে উদাসীকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া কহিল, "তুমি আমাকে ভালবাস উদাসী ?"

প্রশ্নের অর্থ উদাসী ভাল করিয়া বুঝিল না, ললিতের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া তবু কহিল, "বাসি।"

সে রাত্রি আর উদাসীর চোখে ঘুম আসিল না।

পরদিনও ললিতের যাওয়া ঘটিল না। দীপান্বিতার পরদিন যদুর মাতার পায়ের ধূলা লইয়া ললিত কলিকাতা যাত্রা করিল। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে উদাসীকে নিভৃতে ডাকিয়া ললিত তাহার মুখে চুমা দিয়া কহিল, "আমি তোমাকে বিয়ে করব উদাসী।"

উদাসী চোখের জল মুছিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে ?"

"কল্‌কাতা গিয়ে সব ঠিক্ ক'রে চিঠি লিখ্‌ব। যদু তোমাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি কর্ত্তে সহরে নিয়ে যাবে সেই সময়।"

উদাসী—ললিতের বুকে মাথা রাখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

ললিত চলিয়া গিয়াছে, উদাসীর কিছু ভাল লাগে না। সঙ্গিনীরা আসিয়া ডাকিয়া যায়, উদাসী ঘরের কোণে চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকে, সাড়া দেয় না। জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে দাঁড়াইয়া খেলা দেখে, খেলায় যোগ দিতে তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহই দেখা যায় না। ললিত তাঁহাকে ইংরাজী শিখিতে বলিয়া গিয়াছিল, তাই শুধু পড়াশুনায় তাহার বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। পূর্ব্বে অতি প্রত্যুষে যখন সে ফুলের সাজি লইয়া বাহির হইত, আজকাল সে সময় ফার্ষ্ট বুক খুলিয়া ইংরাজী শিখিতে বসে। যদু দেখিয়া খুসী হয়, আর মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়া বলে, "বড় দিনের সময় সহরে গিয়ে তোকে ইস্কুলে দিয়ে আসব।"

উদাসী শুনিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে চীৎকার করিয়া এ, বি, সি, ডি পড়িতে থাকে।

কথা ছিল কলিকাতা পৌছিয়া ললিত প্রতি সপ্তাহে একখান করিয়া পত্র দিবে কিন্তু দাদার কাছে পৌছানো-খবরের এক পোষ্ট-কার্ড ছাড়া আর কোনও চিঠি সে লেখে নাই। যদুর পকেট হইতে চিঠিখানা চুরি করিয়া উদাসী রাখিয়াছিল; অবকাশ হইলেই সেখানা একবার করিয়া পড়িত; পড়িতে পড়িতে চিঠিখানার আদ্যো-পান্ত উদাসীর মুখস্থ হইয়া গেল, তথাপি নূতন চিঠি আসিল না।

একদিন উদাসী ধরা পড়িয়া গেল, চিঠিখানা কোলের উপর রাখিয়া উন্মনা হইয়া বসিয়াছিল, কুমুদিনী কখন যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। বৌদিদির কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া চিঠিখানা লুকাইবার উপক্রম করিতেই কুমুদিনী তাহার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া কহিল, "কিলো, শকুন্তলা হ'য়েছিস্ যে!"

বলা আবশ্যক যে, কুমুদিনী গ্রামের মেয়ে-ইস্কুল হইতে উচ্চ-প্রাইমারী পাশ করিবার পর বটতলার কমবেশী ত্রিশখানা উপন্যাস পাঠ করিয়া এক রকম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কুমুদিনীর কথায় বাঁ-হাতে চিঠিখানা মুড়িয়া উদাসী উঠিয়া দাঁড়াইল; কুমুদিনী চিঠিখানা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেই উদাসী তাহার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি বৌদিদি!"

তখনকার মত উদাসী বাঁচিয়া গেল কিন্তু বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইল না। আদর করিয়া ভুলাইয়া সন্ধ্যা নাগাইদ্ কুমুদিনী সমস্তই জানিয়া লইল। মনের মধ্যে যে আনন্দ ও সন্তাপ একত্র জমিয়া উঠিয়াছিল তাহার বোঝা একজনের কাছে নামাইতে পারিয়া উদাসীও বাঁচিয়া গেল। সকল শুনিয়া কুমুদিনী আদৌ বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ করিল না বরং ঠাট্টা করিয়া কহিল, "এবার জামাই-ষষ্ঠীতে আস্‌তে ললিতকে চিঠি লিখে দেব, কেমন?"

উদাসী ছুটিয়া পলাইল।

মধ্যে উদাসীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া ললিত এক পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল, তাহার পর মাস-দুই কাটিয়া গেল, উদাসী ফার্ষ্ট-বুক শেষ করিয়া সেকেণ্ড-বুক আরম্ভ করিল; তথাপি আর ললিতের কোন সংবাদ আসিল না।

কিছুদিন পর সহসা একদিন ব্যাগ হাতে করিয়া যদু কলিকাতা যাত্রা করিল; উদাসী প্রণাম করিতে আসিয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। পূর্ব্বদিন রাত্রে কুমুদিনীর মুখে উদাসীর সম্বন্ধে একটি কথা শুনিয়া যদু দুর্ভাবনায় সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। হঠাৎ কলিকাতা যাইবার হেতু পিতা-মাতা উভয়েই জিজ্ঞাসা করিল। যদু উদাসীর দিকে একটি ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি হাসিয়া সংক্ষেপে কহিল, "কাজ আছে।"

দাদার মুখ দেখিয়া উদাসীর ভয় হইল। বৌদিদিকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কেন গেল বৌদি?"

কুমুদিনী বিষণ্ণ মুখখানি যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিয়া কহিল, "তোর বর খুঁজতে।"

উদাসী নিত্যকার মতই পলাইয়া গেল।

ছেলে-বৌতে ঝগড়া হইয়াছে মনে করিয়া বুড়ী এতদিন বৌকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, কিন্তু যখন সাত দিনেও যদু ফিরিল না তখন বুড়ী শঙ্কিত হইয়া যদুর অকস্মাৎ কলিকাতা গমনের কারণ বধূকে জিজ্ঞাসা করিল। দুর্ভাবনার ভার একা আর কুমুদিনী বহিতে পারিতেছিল না। যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া তাহার সন্দেহের কথা শাশুড়ীকে জানাইল। শুনিয়া দুই

চোখ কপালে তুলিয়া বুড়ী মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে দিন সন্ধ্যায় কুমুদিনী উদাসীকে ঘরে টানিয়া আনিল। তাহার বাল্য-সখীদের বিবাহ হইবার অনেক পরে, বয়স হইয়া বিবাহ হইয়াছে, নারী-জীবনের অনেক রহস্য তাহার জানা ছিল। ললিত চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে উদাসীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, মনে তাহার সম্বন্ধে একটা সংশয় জন্মিয়াছিল। যদুকে তাহার আভাসও সে দিয়াছে। কয়েক দিন হইতেই উদাসীকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, নিতান্ত সঙ্কোচের বশেই পারে নাই। আজ উদাসীকে ঘরে টানিয়া আনিয়া কুমুদিনী তাহার চিবুকে হাত দিয়া কহিল, "আমাকে লুকোবিনে উদাস?"

বৌদিদি কি জিজ্ঞাসা করিবে উদাসী তাহা জানিত না; কহিল, "না বৌদিদি।"

কিন্তু ইহার পর কুমুদিনী তাহাকে যে প্রশ্ন করিল তাহা শুনিয়া উদাসী লজ্জায় মরিয়া গেল। কুমুদিনী তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া অনেক বুঝাইল। উদাসী বৌদিদির বুকের কাপড়ে মুখ লুকাইয়া কোনমতে তাহার প্রশ্নের জবাব দিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া কুমুদিনী কহিল, "ঘরে ব'সে থাক্! কারো সাম্‌নে বের হস্‌নি, বুঝলি?"

উদাসী বুঝিল না তথাপি প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

কিছুকাল পর অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া সে অপাঙ্গে একবার

বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বৌদিদির চমৎকার মুখখানি একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে।

কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে কেন বৌদিদি তাহাকে নিষেধ করিয়াছে উদাসী তাহা বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। তবে দেখিল, অকস্মাৎ সমস্ত বাড়ীখানা যেন তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া গিয়াছে। বাপ তাহাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয়, মা বাঁ-হাতে ভাতের থালাখানি দূর হইতে ঠেলিয়া দেয়, উদাসী অভিমানে অর্দ্ধভুক্ত ভাতের রাশি ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে, আগেকার মত কেহ আর সাধিয়া খাওয়ায় না। বেশী কথা বলা কোন কালে তাহার অভ্যাস ছিল না, সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে না। যদুর বড় শালা মাণিক ইতিপূর্ব্বে কোনোদিন তাহার সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই, আজ সে দুরজার ফাঁক দিয়া চাহিয়া কেমন করিয়া হাসে উদাসীর সর্ব্বাঙ্গ শির্ শির্ করিয়া উঠে, সে ঘরে গিয়া শয্যা লক্ষ।

বৌদিদি ব্যতীত কাহারও সহিত কোনদিন সে বেশী কথা কহিত না, কিন্তু সেই দিন বৌদিদিকে সেই কথা বলিবার পর আর সে তাহার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই। কিন্তু সমস্ত বাড়ীখানার এই বিরূপ-মূর্ত্তি তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন রাত্রে কুমুদিনী ঘরে আসিলে উদাসী তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি হ'য়েছে বৌদিদি? সবাই—" এই পর্য্যন্ত কহিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এত বড় মেয়ে কিছু বোঝে না! কুমুদিনী অবাক হইয়া গেল।

খানিক পরে উদাসীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "পাগলামি করিস্‌নে উদাস, স্থির হ'য়ে শোন্‌ বল্‌ছি।" :

উদাসীর নিকট সত্য গোপন করিবার আর প্রয়োজন ছিল না। কুমুদিনী সমস্তই খুলিয়া বলিল। শুনিয়া উদাসী মুখ নীচু করিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

উদাসী সন্তানের জননী!

সহসা উদাসীর চক্ষের সম্মুখের একখানি যবনিকা যেন অপসৃত হইয়া গেল! বর্ষীয়সীদের মুখে এই আলোচনা সে একাধিকবার শুনিয়াছে, সঙ্গিনীরা একত্র বসিয়া নারীর এই পরিবর্ত্তনের অর্থ আবিষ্কারের বহু চেষ্টা করিয়াছে—কোনো দিন অর্থবোধ হয় নাই, আজ উদাসী বুঝিল! মাঝে মাঝে নিজদেহের একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন উদাসীর চোখে পড়িত—সেটিকে উদাসী এ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে নাই, আজ লজ্জায় উদাসী—নিজের দিকে চাহিতে পারিল না। পরদিন সমস্ত দিনমান একখানি কাঁথা গায়ে জড়াইয়া সে ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

ক্রমে কুমুদিনী ব্যাপারটির গুরুত্ব উদাসীকে বুঝাইয়া দিল। উদাসী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। •গ্রামের আরও একটি মেয়ের কাহিনী—কতক তাহার জানা ছিল—তখন এ বিষয়ে তাহার জ্ঞান বিশেষ সচেতন ছিল না। অনেক দিনের কথা হইলেও আজ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটি বিচিত্র-বর্ণের একখানি ছবির মত চোখে পড়িল। টুপি-পরা দারোগা ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আগে চলিয়াছেন, তাঁহার পিছনে একবুক ঘোম্‌টা-দেওয়া একটি মেয়ে,

তাহার সঙ্গে দুই চৌকীদার কনুই দিয়া তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া চলিয়াছে, আর দুইধারে দাঁড়াইয়া গ্রামের কয়েকটি ছেলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে—আর পিছনে একটি বুড়ী মাটিতে পড়িয়া মাথা কুটিতেছে। ইহার পর আর মেয়েটিকে সে দেখে নাই ; কিন্তু পরদিন কি একটা ঘটিয়াছে শুনিয়া সখীদের সঙ্গে লুকাইয়া বুড়ীকে দেখিতে গিয়াছিল—দেখিল, গলায় ফাঁস দিয়া বুড়ী ঘরের চালা হইতে ঝুলিতেছে ; তাহার চোখ দুটির কথা মনে হইয়া আজও উদাসীর ভয় হইল। মনে হইল, বুড়ীর মত তাহার মাও গলায় ফাঁস দিয়া ঝুলিবে হয়ত'! উদাসী কাঁপিয়া উঠিল। কুমুদিনী চলিয়া যাইতেছিল, সহসা উদাসী তাহার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমার কি হবে বৌদিদি ?"

কুমুদিনী তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "ললিত তোকে বিয়ে কল্লেই সব মিটে যাবে। তোর দাদা সহরে তাকে আন্‌তে গিয়েছে। ভয় কি ?"

এই কথায় উদাসী অন্ধকারে আলো দেখিল। ললিত এ সংবাদ শুনিলে একদিনও বিলম্ব করিবে না, তাহাতে তাহার তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না। এমন কি ললিতের আগমন কল্পনায় রাত্রে তাহার সমস্ত দুর্ভাবনার যেন শেষ হইয়া গেল। সারারাত্রি নিজের অবস্থার-কথা আর সে ভাবিতে পারিল না—বারবার ললিতের মুখখানিই মনে পড়িতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অন্ততঃ বিশবার উদাসী মা-সুবচনীর কাছে যুক্তকরে প্রার্থনা জানাইল, "হে মা, দাদার সঙ্গে যেন তাঁর দেখা হয়।"

মা-সুবচনী প্রার্থনা শুনিলেন, ললিতের সঙ্গে যদুর দেখা হইল।

*   *   *   *

ললিত কেবল সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়াছে, সেই সময় যদু আসিয়া উপস্থিত হইল। ললিত হাসিয়া কহিল, "যদু যে! এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?"

যদুর মাথায় খুন চাপিয়া গেল কিন্তু বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে কহিল, "তোমাকে দেখতে এলাম। চিঠি-পত্র দাও না যে।"

ললিত কহিল, "সময় পাইনে ভাই! জান তো দেশের কাজ কর্‌তে গেলে—"

তারপর কথা ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উদাসী কেমন আছে? ইস্কুলে ভর্ত্তি করতে চেয়েছিলে যে!"

যদু প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল যে, যেমন করিয়াই হৌক ললিতের সহিত উদাসীর বিবাহ দিয়া এই কলঙ্কের শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিবে। ললিত যে উদাসীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে স্ত্রীর মুখে সে-কথা সে শুনিয়াছিল।

ললিতের প্রশ্নে সুযোগ পাইয়া যদু কহিল, "তার জন্যেই ত আসা। সবার ইচ্ছে উদাসীকে তোমার হাতে দিয়ে—"

ললিত হাসিয়া কহিল, "বেশ তো, ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে যাও—গার্জ্জেন হ'য়ে দেখা-শোনা কর্ব্ব। দেশের নারীরা যদি—"

যদু বাধা দিয়া কহিল, "সে সব তুমি যা পারো ক'রো। উদাসীর বিয়ে দিতে চাই। তুমি তাকে—" যদু কি বলিবে তাহা অনুমান করিয়া ললিতের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল; সন্ধ্যার অন্ধকারে যদু তাহা দেখিতে পাইল না।

ললিতকে নীরব দেখিয়া যদু কহিল, "উদাসী তার বৌদিদিকে সমস্ত বলেছে, এ অবস্থায়—"

ললিতের মুখ শুকাইল, চারিদিক চাহিয়া সে কহিল, "আমার মা আছেন জান তো। তাঁকে—"

আর ধৈর্য্য রাখা যদুর পক্ষে অসম্ভব হইল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "যখন আশা দিয়েছিলে, তখন তো মার কথা মনে করনি—আর আজ তাকে বিপদে ফেলে—" এই সঙ্গেই আরও কয়েকটি এমন কথা যদু কহিয়া গেল যাহা শুনিয়া যদুর হাতের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে ললিতের সাহসে কুলাইল না। সে দরজার কাছে সরিয়া গেল। যদু কহিল, "যদি তুমি তাকে বিয়ে না করো তা হ'লে—"

ললিত সে-কথার স্পষ্ট জবাব না দিয়া কহিল, "তুমি একটু বাইরে চল যদু, তোমার শোবার ব্যবস্থাটা আগে করে আসি।"

যদু প্রশ্ন করিল, "কেন, এখানে?"

"—অসুবিধে আছে।"

উভয়ে বাহির হইয়া গেল। হ্যারিসন্ রোডের এক হোটেলে যদুর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া ললিত কহিল, "কাল সকালেই আমি আসব, তুমি থেকো! তখন সব কথাবার্ত্তা ক'য়ে এর ব্যবস্থা কর্ব্ব।"

বলিয়া ললিত বাহির হইয়া আসিল। যদু নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু পরদিন প্রাতে দশটা পর্য্যন্ত যদু হোটেলে অপেক্ষা করিল, তথাপি ললিত আসিল না। তখন সে নিজেই ললিতের মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। মেসের ম্যানেজার কহিল, "তিনি তো কাল রাত্রেই মেদিনীপুর গেছেন, সেখানে সভায় তাঁকে গান গাইতে হবে।"

রুদ্ধ-নিশ্বাসে যদু কহিল, "কবে ফিরবেন?"

ম্যানেজার কহিল, "জিনিস-পত্তর সব নিয়েই গেছেন, কবে ফিরবেন ঠিক নেই।"

যদু বুঝিল যে ললিত পলাইয়াছে। তথাপি আরও দিন-কয়েক ললিতের জন্য সে অপেক্ষা করিল।

ললিত ফিরিল না।

শুধু উদাসী নহে উদাসীর পিতা-মাতা ও কুমুদিনী সকলেই ললিতের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। ললিতের হাতে কোন মতে উদাসীকে সঁপিয়া দিতে পারিলেই মুক্তি! তাহার পর যাহা হয় হোক্। এই কল্পনাটুকু দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও সকলকে একটু স্বস্তি দিতেছিল; কাজেই যদু আসিয়া পৌঁছিবামাত্র উদ্বিগ্ন উৎসুক-মুখে তিনটি প্রাণী যদুকে গিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যদু চাপা-গলায় এক নিশ্বাসে ললিতের সহিত তাহার সাক্ষাতের বৃত্তান্ত কহিয়া গেল। শুনিয়া বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মধু মণ্ডল পাংশু মুখে রুদ্ধ-নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে উপায়?"

যদু উদাসীর ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভেবে দেখি।"

দিন-কয়েক হইতে উদাসী প্রতিদিন প্রত্যুষ হইতেই জানালা

একটুখানি ফাঁক করিয়া নদীর ঘাটের পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। এই পথ দিয়া ললিতের আসিবার কথা। আজও দাঁড়াইয়াছিল। দাদাকে দেখিয়াই আর-একজনের প্রত্যাশায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আলুথালু চুলগুলি ললাট হইতে সরাইয়া আঁচলখানি ঘোমটার মত করিয়া মাথায় টানিয়া দিল। দাদা বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল, তথাপি আর কাহাকেও পথে দেখা গেল না। উদাসী ভাবিল—ললিত নৌকায় আছে, লজ্জায় আসিতে পারিতেছে না। কিন্তু সহসা মায়ের ক্রন্দন-স্বর শুনিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে যত্নুর একটি কথা শুনিয়া বুঝিল যে, ললিত আসে নাই। উদাসীর আর নড়িবার সামর্থ্য রহিল না।

* * * *

উদাসী আর ঘরের বাহির হয় না। দরজার ফাঁক দিয়া সে ঘরকন্নার কাজ দেখে; পূর্ব্বে উদাসী ভিন্ন যে-কাজ হইত না, সে সকল কাজ মা একাই করিয়া যায়, মায়ের পাশে গিয়া একবার বসিতে উদাসীর ইচ্ছা করে, কিন্তু কেহ তাহাকে ডাকে না। সেদিন উদাসীর বুধী-গাইটি আসিয়া উৎপাত করিতেছিল, মধু মণ্ডল কিছুতেই তাহাকে রাখিতে পারিতেছিল না, উদাসী বাহিরে আসিয়া বুধীর গায়ে হাত দিতেই পিতা এমন করিয়া তাহার দিকে চাহিল যে, উদাসী দেখিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল।

মুমূর্ষু রোগীর কক্ষের দিকে যেমন-দৃষ্টিতে আত্মজন চাহিয়া থাকে, তাহার রুদ্ধদ্বার গৃহের দিকে তেমনি শঙ্কিত-নেত্রে সকলে

চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহে,—উদাসী দেখে। বৌদিদিও যেন কয়েকদিন হইতে কেমন হইয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া কথা কহে না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে রুখিয়া উঠে, উদাসী ভয়ে স্থবিরের মত বসিয়া থাকে। কুমুদিনী ভাতের থালা নীরবে ঘরের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া যায়। কোনো-কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করে না। সম্প্রতি তাহার সঙ্গিনীরাও বাড়ীর উপর দিয়া চলে না; পাড়ার মেয়েদের চলাচলের জন্য যে সঙ্কীর্ণ পথটি গৃহের পাশ দিয়া ছিল, যদু সেদিন একটা বেড়া দিয়া সেটাকে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সমস্ত দিন তাহার ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া উদাসী বসিয়া থাকে। জানালা খুলিলেই মনে হয়, যেন আকাশের সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া মাটির গাছ-পালাগুলি পর্য্যন্ত তাহার দেহের অঙ্গ-বিশেষের দিকে চাহিয়া আছে। কলের পুতুলের মত ঘরের জিনিসগুলি নাড়াচাড়া করিয়া উদাসী দিন কাটাইয়া দেয়। নিজের অবস্থার কথা মনে হইলে গালে হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে, ভাবনার যখন আর শেষ হয় না, তখন বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে।

এমনি করিয়া উদাসীর দিন কাটে।

সেদিন স্নানের ঘাট হইতে মা আসিয়া যদুর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল "যা হয় একটা ব্যবস্থা কর বাপ্! আর সহ্য হয় না যে!"

যদু বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যাপারটি এই—উদাসীর মা ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল,

ও-পাড়ার গৃহিনীরাও ছিলেন। ঘোষ-গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদুর মা, উদোসকে দেখিনি যে অনেক দিন, কি হ'য়েছে ?"

বুড়ী কাঁপিয়া উঠিল, কোনক্রমে কহিল, "জ্বর।"

ঘোষ-গিন্নী পার্শ্ববর্ত্তিনী গৃহিণীর গা টিপিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন, "জ্বর! ওমা তা তো জানিনি! আজ গিয়ে দেখে আস্‌ব।'

বুড়ীর আর স্নান করা হইল না, একেবারে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

মধু মণ্ডল বাহির হইতে আসিয়া সমস্ত শুনিল, তাহার পর স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া রান্নাঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "যেমন গর্ভে ধরেছিলে তেমনি ভোগো!"

বুড়ী ধমক্ খাইয়া চুপ্ করিয়া গেল।

স্ত্রীকে ধম্‌কাইয়া মধু মণ্ডল বাহিরে গিয়া ভাবিতে বসিল। সমস্ত ঠিক্ করিয়া উদাসীকে কাহারও সহিত কাশী পাঠাইয়া দিবে বুড়ার মনে এইরূপ একটা সঙ্কল্প ছিল। ভিতরে ভিতরে একটি ভাল-মানুষের সন্ধান চলিতেছিল, সহসা আজ স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। গ্রামের হালচাল সে ভালই জানিত —কোনক্রমে এ-সংবাদ বাহিরে কেহ জানিতে পারিলে থানা-পুলিশ পর্য্যন্ত গড়াইবে। তাহার পর যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হইবে। ভাবিতে ভাবিতে বুড়ার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল।

যদু আসিয়া দেখিল, পিতা কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে। যদুকে দেখিয়াই মধু মণ্ডল কহিল, "পাপ বিদেয় ক'রে দেরে যদু! শেষে বুড়ো কালে থানায় দিবি ?"

গ্রামে উদাসীর কথা লইয়া কানা-ঘুষা চলিতেছে তাহা যদু শুনিয়াছিল। আজ বুঝিল, বিপদ আসন্ন। পুলিশের কথা শুনিয়া তাহারও ভয় হইল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মধু মণ্ডল কত কি ভাবিল। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখিল যে, থানার সিপাহীরা আসিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। বুড়া 'গোবিন্দ! গোবিন্দ!' বলিয়া চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল। তখন প্রায় ফর্সা হইয়াছে। দেখিল বাহিরের ঘরের রোয়াকে কে যেন একজন বসিয়া আছে। ডাকিল, "কে ও!"

উত্তর আসিল, "মফিজ চৌকীদার!"

মধু মণ্ডল বিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ চৌকীদারের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "শেখের-পো, এত সকালে যে?"

মফিজ শেখ সংক্ষেপে জানাইল যে, মণ্ডলের বিধবা কন্যার গর্ভ হইয়াছে, দারোগা-সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে বাড়ীতে চৌকী দিবার জন্য মোতায়েন করিয়াছেন।

মধু মণ্ডল আতঙ্কে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল, মুখে তাহার আর কথা জোগাইল না।

রাত্রি শেষে উদাসীর তন্দ্রা-বোধ হইয়াছিল। হঠাৎ চৌকীদারের নাম শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর ঘরের বেড়া একটুখানি ফাঁক করিয়া চৌকীদারকে দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে সেই মেয়েটির কথা মনে পড়িল। আতঙ্কে আর্তনাদ

করিয়া ঘরের কোণে সুপ্ত ছোট ভাইটিকে প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে উদাসী মুখ লুকাইল। হঠাৎ জাগিয়া ছোট ভাই নিধুও চীৎকার করিয়া উঠিল।

যদু চৌকীদারের আগমন-বার্ত্তা জানিত না; চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, উদাসী নিধুকে জড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। যদু জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে নিধু?" নিধু কিছু কহিতে পারিল না, উদাসী বাহিরের দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া চাপাগলায় কহিল, "চৌকীদার!"

মফিজ চৌকীদার যখন মধু মণ্ডলের নিকট হইতে পাঁচটাকা মর্য্যাদা আদায় করিয়া সে-দিনের মত ফিরিয়া গেল, তখনও উদাসী ঘরের এক কোণে কলসীর আড়ালে একখানি মোটা কাঁথায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইয়া গেল তথাপি সে উঠিল না। নিত্যকার মত কুমুদিনী—ভাতের থালা ঘরে রাখিয়া চলিয়া গেল। উদাসী পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া একবার নিতান্ত অসহায়ের মত কুমুদিনীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কুমুদিনী কথা কহিল না। ক্রমে সমস্ত আঙ্গিনায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তবু সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল না; উদাসী অন্ধকারে বসিয়া রহিল। বাড়ীতে একটা কিসের নিঃশব্দ সম্ভ্রস্ত আয়োজন চলিতেছিল—কাহারও অবকাশ ছিল না।

প্রহর রাত্রির শেষে বুড়ী একটি প্রদীপ লইয়া উদাসীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ভাতের থালা তেমনই পড়িয়া আছে। উদাসী দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বসিয়াছিল, বুড়ী তাহাকে জড়াইয়া

ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল,"জন্মের মত এ-বাড়ীর ভাত দু'টো মুখে দিয়ে যা মা!" উদাসী মূঢ়ের মত মায়ের মুখের দিকে চাহিল, কিছু বলিল না। বাহির হইতে যদু চাপা-গলায় কহিল, "বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে বেরিয়ে পড় মা!" কুমুদিনী বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া উদাসীকে বাহির করিয়া আনিল।

আঙ্গিনার অপর প্রান্তে কালো কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পুঁটুলি হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল, সে মাণিক। নগদ পাঁচ শত টাকা পথ-খরচ পাইয়া তীর্থে কোনো ভাল-মানুষের হাতে উদাসীকে সমর্পণ করিয়া আসিতে সে রাজী হইয়াছিল।

বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া উদাসী কলের পুতুলের মত বাড়ীর আঙ্গিনা পার হইয়া আসিল। পিতামাতা, ভাই, কাহারও দিকে চাহিল না। তাহার শিউলী-তলার খলাখানি যখন উদাসী ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন বুড়ী গুটিকয়েক মুড়ির মোয়া পুঁটুলী করিয়া ছুটিয়া আসিল, "সারাদিন খাস্‌নি মা! নিয়ে যা!" শিউলী-তলায় অন্ধকারে মধু মণ্ডল দাঁড়াইয়াছিল দৃঢ়-মুষ্টিতে স্ত্রীর হাত ধরিয়া সে কহিল, "চুপ!" উদাসী পিতা-মাতা উভয়ের কথাই শুনিল, কিন্তু ফিরিয়া চাহিল না।

* * * *

মাঠে পড়িয়া মাণিক মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কষ্ট হচ্ছে উদোস ঠাকুর-ঝি?"

উদাসী কহিল, "না।"

মাণিক কহিল, "বাড়ীর ঘাটে গেলে লোক জানাজানি হবে, তাই সাতপুতের ঘাটে যাচ্ছি। বেশী নয় ক্রোশ-পাঁচেক।" উদাসী অগাধ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হোক্!"

হোক্। তবু এ মুক্তি! এ মুক্তি! উদাসীর মাথার উপর সীমাহীন নীলাকাশ। চারিধারে প্রান্তরের বিস্তার। সম্মুখে মুক্ত দীর্ঘ পথ। অনেকদিন পরে আজ পৃথিবীকে উদাসীর ভাল লাগিল।

শীতের বাতাস হু হু করিয়া একবার মাঠের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

মাণিক উদাসীর গা ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, "আর একটু জোর পায়ে চল্‌তে পার্‌বে ঠাকুর-ঝি? আর ক্রোশ-দুই, ভোর না হতেই নৌকো নেব।" কণ্টকবিক্ষত পায়ের দিকে একবার চাহিয়া উদাসী কহিল, "পার্‌ব।"

মাথার উপর দিয়া একটা পাখী ডাকিয়া গেল।

খানিক পথ গিয়া উদাসী কহিল, "একটু দাঁড়াও মাণিক-দাদা! জিরিয়ে নিই।"

মাণিক কহিল, "সর্ব্বনাশ! ওই বাঁশ-বনের ওধারে থানা! এখানে কি দাঁড়ানো যায়!"

থানার নাম শুনিয়া উদাসী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "তাহ'লে ছুটে চল মাণিক-দাদা!"

উভয়ে দ্রুত-পদে চলিল, কিন্তু অতি অল্পকালের জন্য। পথের বাঁকের মুখে জোড়া বাবলা-তলায় দাঁড়াইয়া উদাসী কহিল, "আর

পার্‌ব না মাণিক-দা! দম আট্‌কে আস্‌ছে।" কহিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া উদাসী বসিয়া পড়িল।

* * * *

পরদিন প্রভাতে সাতপুতের ঘাটের লোক—জোড়া বাবলা-তলায় আসিয়া দেখিল—দুই বাহু দিয়া একটি প্রাণহীন শিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া রক্ত-লিপ্ত দেহে একটি কালো-মেয়ে মুক্ত-আকাশের দিকে নিষ্প্রভ-নেত্রে চাহিয়া আছে। দেহে জীবন নাই।

সে কে কেহ তাহা জানিল না।

দেশে ফিরিতেছিলাম, সঙ্গীর মুখে এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে কখন যে মাঠের মাঝখানে আসিয়া পৌছিয়াছি খেয়াল ছিল না।

সঙ্গী কহিল, "এ সেই জোড়া বাবলা-তলা!"

থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

দক্ষিণের উদাস-বাতাস হা হা করিয়া উদাসীর মাঠের বাবলার সারি দোলাইয়া চলিয়া গেল।

ক্যানভাসার

সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কিনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু গার্ড সবুজ নিশান দোলাইতে তাড়াতাড়ি সম্মুখের থার্ডক্লাশেই উঠিয়া বসিলাম। ভদ্রবেশ দেখিয়া সামনের বেঞ্চের এক কোণ হইতে খানিকটা সরিয়া গিয়া একটি হিন্দুস্থানী যাত্রী কহিল, "বৈঠিয়ে বাবুজী।"

আমার একটি বদ্ অভ্যাস আছে, গাড়ীতে উঠিলেই ঘুম পায়। বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। মেল ট্রেন, আধ ঘন্টার মধ্যে আর কোথাও দাঁড়াইবে না। একটু তন্দ্রার আকর্ষণ হইতেছিল, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। কে যেন ঠিক কানের কাছেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "যদি বাঁচতে চান—"

সভয়ে চমকিয়া উঠিয়া চোখ মেলিলাম, দেখিলাম গাড়ীর কাঠের দেয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া একখানি মলিন ঝুটা-হাঁসিয়াদার লাল-র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া ভাঙা কাঁসির আওয়াজে একজন আধাবয়সী শীর্ণকায় ভদ্রলোক বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার বাঁ-হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ, ডান-হাতে লাল লেবেল লাগানো একটি শিশি।

"যদি বাঁচ্তে চান তবে আজই এক শিশি কিনে নিয়ে যান, নিয়ে গিয়ে যত্ন করে তুলে রেখে দিন, কাজে লাগবে। এতে কাশি

সারে, হাঁপি সারে, উংকাসি, খুংকাশি, যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, আমাশয়, উদরাময়জনিত কাশি, সব সারে। শুধু কাশি নয় সকল রকম ব্যাধি সারে। ছোট ছেলের পেঁচোয় পাওয়া, মেয়েদের হিষ্টিরিয়া, চোখ-ওঠা, কান দিয়ে পুঁয পড়া, বাত, আমবাত, গিঁট বাত, পক্ষাঘাত, দাদ, চুলকানি, পাঁচড়া সারে। এই যে ধন্বন্তরি বটিকা অনুপান ভেদে এতে না সারে—”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ভদ্রলোক কাশীতে লাগিলেন। মিনিটখানেক অবিশ্রান্ত কাশিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভদ্রলোক আবার বক্তৃতা সুরু করিয়া দিলেন, “যদি বাঁচতে চান, ধন্বন্তরি বটি আজই কিনে নিয়ে যান। ফাঁকি নাই, গবর্ণমেণ্ট থেকে রেজেষ্টারী করা বড়ি, সর্ব্বরোগে ধন্বন্তরি। জ্বরে শিউলী-পাতা, কালাজ্বরে পান, পালাজ্বরে ক্ষেতপাপড়া, সর্দ্দিতে আদা, কাশিতে নিমপাতার রস, যক্ষ্মায় পিপুল, রাজযক্ষ্মায় বচ, নিউমোনিয়ায় যষ্টিমধুর গুঁড়ো দেবেন—এক বড়িতে জল হ’য়ে যাবে। কানে পুঁয হলে বড়ির সঙ্গে ফটকিরী পিষে একটি বার; দাদ চুলকানিতে তুঁতে আর পাঁচড়ায় চালমুগরার তেলে গুলে। নেবেন?”

ভদ্রলোক একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন, “নেবেন? বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে আছে, বুড়ো-বুড়ি আছে, যুবক-যুবতী আছে, তাঁদের সবারই দরকার, নিয়ে যান। দাম বেশী নয় বত্রিশ পয়সা, শিশিটা অমনি দিচ্ছি। ভাবুন মনে একবার আপনার সব ব্যারাম সারিয়ে নিচ্ছি মোটে আট আনা—ডাক্তার ডাকলে এতগুলো ব্যারামে অন্তত চার-পাঁচশ টাকা খরচ হত। আসুন।”

বক্তৃতা ভালই লাগিতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ আবার রসভঙ্গ হইল। ভদ্রলোক ভয়ানক কাশিতে লাগিলেন। কাশি থামিলে আবার বক্তৃতা আরম্ভ হইল। একটু মিহি আওয়াজে। "নেবেন? দেখুন ভেবে বাড়ী গিয়ে হয় ত দেখবেন খুকীর জ্বর, খোকার পেট-বেদনা, গিন্নীর হিষ্টিরিয়া। হিষ্টিরিয়া হ'লে দু'টি বড়ি শনি মঙ্গল বারে তিন ধাতুর মাদুলিতে ভ'রে লাল সুতোয় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেবেন—বাস্ জল! আর সব ব্যারামের অনুপানের কাগজ পাবেন বিনি পয়সায়—আসুন!"

দুই একজন যাত্রী বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কোণের একটি লোক পকেটেও হাত দিল। দেখিয়া ভদ্রলোক স্মিতমুখে আরও একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন, "আসুন! এই ধন্বন্তরি বটি সব ব্যারামের দাঁতকপাটি—বত্রিশ বড়ি বত্রিশ পয়সা?" দুই একখানি হাত ধীরে ধীরে পকেট হইতে বাহির হইতেছে দেখিলাম। ভদ্রলোকের চোখ দু'টি আনন্দে হাসিয়া উঠিল। তিনি আবার গোড়া হইতে সুরু করিলেন, "কাশি সারে, হাঁপি সারে—" কিন্তু এবারকার বক্তৃতাও বাধা পাইল, বক্তা আবার কাশিতে আরম্ভ করিলেন! এই সময় পিছন হইতে অল্পবয়সের একটি ছোক্‌রা বিরক্ত হইয়া কহিয়া উঠিল, "দেখ্‌ছি যে সবই সারে আপনার কাশিটা ছাড়া। থামুন!" ভদ্রলোকের মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। যে দুই একখানি হাত পকেট হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল সেগুলিও আবার পকেটে গিয়া ঢুকিল। ভদ্রলোক আর কথা কহিলেন না, শিশি-হাতে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বাহিরের দিকে

চাহিয়া রহিলেন। কি মনে করিয়া আমি ডাকিলাম, "আসুন এদিকে।"

ভদ্রলোক মন্থরপদে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নেবেন?"

ঔষধ লইবার প্রয়োজন ছিল না, তবু একটি টাকা বাহির করিয়া কহিলাম, "দিন দু'শিশি।"

একটি নিৰ্জ্জীব হাস্যের সহিত টাকাটি পকেটে ফেলিয়া ক্যানভাসার কহিলেন, "আপনার হাতেই আজ বৌনি হ'ল। ভগবান আপনার—"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "ওষুধটা আপনার?

"আজ্ঞে, না। আমি ক্যানভাসার।"

"ক্যানভাসার! আমি ভেবেছিলাম—যাক্, মাইনে?"

চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া ক্যানভাসার কহিলেন, "পনেরো; তবে প্রোপাইটারের হুকুম কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লে বল্‌তে হবে পঁয়ত্রিশ। তিনি বলেন, নৈলে ওষুধের মান থাকে না। তবে কমিশন আছে। টাকায় দু'পয়সা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাতে পোষায়?"

"এক রকম। না পোষালে চলে কি ক'রে? আর খেটে খেতে হবেই তো।"—বলিয়াই তিনি আবার কাশিতে কাশিতে লাল হইয়া উঠিলেন। কাশি থামিলে কহিলাম, "কাশিটা তো ভাল নয় মনে হচ্ছে। নিজের ওষুধটাই—" স্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া ভদ্রলোক কহিলেন, "ছাই হবে মশাই! আমার এ তো কাশি নয়, কাল।

কোনো রকমে মাঘ মাসটা পেরিয়ে গেলেই বাঁচি। মেয়েটা বড্ড বড় হ'য়ে উঠেছে, ছুটি নিতে সাহসে কুলোচ্ছে না। হাজার-তিনেক শিশি বেচে দিতে পার্‌লে টাকায় তিন পয়সা কমিশন দেবেন মালিক বলেছেন। মাইনে সমেত সাত দিনের ছুটি আর এক মাসের মাইনে আগাম, তারও আশা দিয়েছেন। মালিক লোক ভাল, তাঁতি-পাড়ার ব্রজ পালকে চেনেন তো? তিনিই।"

কোথায় বা তাঁতিপাড়া, কে বা ব্রজ পাল জানিতাম না, তবু সাম্‌নের ষ্টেশন পর্য্যন্ত গল্প চালাইবার অভিপ্রায়ে কহিলাম, "তাঁতিপাড়া, ব্রজ পাল? তিনি বুঝি—"

ভদ্রলোক পরম উৎসাহের সহিত কহিলেন, "মহৎ লোক মশাই, মহৎ লোক! কল্‌কাতায় তিনতলা বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ, চিটে গুড়ের কারবার। সবই এই বাড়ি থেকে। বড়ি নয় তো সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী। জনত্রিশেক ক্যানভাসার খাটছে!"

গাড়ীর গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। ভদ্রলোক উঠিয়া কহিলেন, "তবে উঠি মশাই।" কহিলাম, "বস্থন। গাড়ী থামুক!"

ক্যানভাসার তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আজ্ঞে না। মালিক পাশের গাড়ীতে আছেন। গলার আওয়াজ না শুন্‌লে ভাববেন বসে আছি।" বলিয়া তারস্বরে ধম্বন্তরি বটিকার জয়কীর্ত্তন করিতে করিতে ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন।

আমি সেকেণ্ড ক্লাশে গিয়া উঠিলাম, কামরায় আর একটি ভদ্রলোক আড় হইয়া শুইয়া আলবোলায় নল টানিতেঃ টানিতে সম্ভবতঃ ভৃত্যকে ধমকাইতেছিলেন। সে বেচারী একটি রূপার

রেকাবে গুটিকয়েক অর্দ্ধভুক্ত সন্দেশ লইয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া ভদ্রলোক সোজা হইয়া বসিলেন। সন্ধ্যা-সূর্য্যের আলোকে তাঁহার চেনের লকেটের হীরাটি জল্ জল্ করিতে লাগিল। অপাঙ্গে একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম। বেশ মোটাসোটা, কালো; পরনে মিহি ফরাসডাঙ্গার কাশীপাড় ধুতি, গায়ে রেশমের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহাতে মতি-বসানো সোণার বোতাম, গলায় সোণার সরু শিকলিতে ঝোলানো একখানা রূপার চৌকা তক্তি, ঘাড়ের কাছে কামানো, মাথায় কাঁচা-পাকা চুলে বাঁকা টেরী, পানে লাল পুরু দুটি ঠোঁট, দুইটি চোখ ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল।

সহযাত্রীটির সহিত পরিচয়লাভের সূত্র খুঁজিতেছিলাম। সহসা ভদ্রলোক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনাকেও ভজিয়েছে দেখ্ ছি!"

বুঝিতে পারিলাম না, কহিলাম, "কি বলুন তো?"

আমার হাতের ধন্বন্তরি বড়ির শিশি দু'টি দেখাইয়া সমস্তগুলি দাঁত বাহির করিয়া পুনরায় ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন, "হাঁ। একেই-বলে ক্যানভাসার! তা বেশ করেছেন। দাম বেশী নেয়নি তো? আমি সব ক্যানভাসারকে বারণ করে দিইছি এক পয়সা বেশী নিলে চাকরী থাকবে না।"

অনুমানে বুঝিলাম ইনিই সেই মালিক ব্রজ পাল। প্রশ্ন করিলাম, "আপনারই ওষুধ বুঝি? কাটে?"

ভদ্রলোক আর একবার হাসিলেন, "কাটে! ক্ষুরের মত কাটে। জন-তিরিশ ক্যানভাসার কাটছে, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইনে—

ওষুধের বাবা কাটবে মশাই। বসিয়ে কি আর কেউ মাইনে গোণে ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিন বের করেছেন ? আগে তো নাম শুনিনি !"

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ব্রজ পালের ধন্বন্তরি বড়ির নাম শোনেন নি ? খবরের কাগজ পড়েন না বুঝি ?

অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "আজ্ঞে বিজ্ঞাপনগুলো পড়্‌বার ফুরসৎ পাইনে। তাই হয়তো—"

ভদ্রলোক যেন একটু উত্তেজিত হইলেন মনে হইল, কহিলেন, "তা যেন না দেখলেন, কিন্তু তাঁতিপাড়ার ধন্বন্তরি দেখেননি নাকি ? গাড়ী-বারান্দাওয়ালা লাল বাড়ীটা। চীনে মিস্ত্রির হাতের রেলিং। সাড়ে বারো কাঠা জমি, সেদিন জহুরী ছগন্‌মল বল্‌ছিল—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ভদ্রলোক আবার হাসিয়া উঠিলেন, "শুন্‌ছেন ! মাইরি, বেড়ে রসিক লোক কিন্তু—শুনুন !"

কান পাতিলাম। পাশের গাড়ী হইতে দম আটকানো একটি কাশির শব্দ, আর তাহারই ফাঁকে ক্যানভাসারের কাসির আওয়াজে সেই পুরাতন বক্তৃতার কয়েকটি কথা শুনিতে পাইলাম,—"কাশি সারে হাঁপি সারে—"

ধন্বন্তরি বটিকার মালিক আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, "বেড়ে রসিক, নামেও রসিক কাজেও—" বলিয়া ভদ্রলোক ভয়ানক হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ফীতোদরের উপর হীরার লকেটটি বারবার আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল, আমি নীরবে তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

হোঁদল কুৎকুতে

ডাক্তার আসিয়া কহিয়া গেলেন, "কিছু না খাওয়াতে পার্লে বাঁচানো যাবে না। যেমন ক'রে হোক্—"

মহেশ ডাক্তারের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "যা হয় করুন ডাক্তারবাবু, সব বেচে' আপনার দেনা শুধ্‌ব! খোকাকে আমায় ফিরিয়ে দিন্!"

নিতাই ডাক্তার ম্লান হাসিয়া কহিলেন, "কি করি বল মহেশ, চেষ্টার তো ত্রুটি নেই দেখ্‌ছ। না খেলে করি কি বল? আজ এই বড়িটা দিয়ে দাও, কাল সকালে আস্‌ব আবার।"

খোকার পোষা ছাগলটি বেচিয়া যে কয়টি টাকা আনিয়াছিল, তাহা ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া মহেশ আবার কাঁদিয়া কহিল, "ভাল ওষুধ দিয়ে যান ডাক্তারবাবু। যত দাম লাগে—"

ডাক্তারবাবু মহেশের হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন, "দরকার হ'লে রাত্রে খবর দিও। আমি আজ বাড়ীতেই থাক্‌ব।" তারপর অচেতন-শিশু রোগীটির দিকে চাহিয়া একটি চাপা-নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঘরের কোণে খোকার চৌকীর পায়ের কাছে বসিয়া মহেশের স্ত্রী নীরবে চক্ষু মুছিতেছিল। মহেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, "কেঁদে আর অকল্যাণ করিস্‌নে, খোকার-মা। পাখাটা নিয়ে বোস্ একটুখানি। আমি মুর্গীহাটাটা দেখে আসি।"

২

নিত্যানন্দ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের দপ্তরী মহেশ বৈষ্ণবের একমাত্র পুত্র মাখনলাল. ওরফে খোকা। তিন মাসের মাহিনা জমাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাধারাণীর সোণার নথ গড়াইয়া দিয়া প্রৌঢ় বয়সে বৎসর পাঁচেক পূর্ব্বে মহেশ সন্তান লাভ করিয়াছিল। শেষ বয়সের সন্তান ; আদরের সীমা ছিল না ! জন্মাবধি খোকার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। দিন-পনেরো পূর্ব্বে খোকার প্রথম জ্বর হয়। সঞ্চিত দুই কুড়ি টাকা ও স্ত্রীর একমাত্র অলঙ্কার মটর-মালা বন্ধক দিয়া যাহা পাইয়াছিল, তাহা দিয়া মহেশ খোকার চিকিৎসা করিল। কাল খোকার পোষা ছাগলটিও বেচিয়া আসিয়াছে।

রোগের প্রধান উপসর্গ আহারে আপত্তি। প্রথম প্রথম খোকা কিছু খাইত ; আজ তিন-চার দিন পথ্য একেবারে বন্ধ। কিছু খাইতে বলিলে, খোকা হোঁদল কুৎকুতে চাহিয়া বসে। এই অদ্ভুত বস্তুটি কি ? মহেশ তাহা বোঝে না। অনেক খুঁজিয়াছে।

ফিরিঙ্গি-পাড়া হইতে নানা রকম পুঁতুল আসিল, খোকা মুখ বাঁকাইয়া টান দিয়া সেগুলিকে ফেলিয়া দিল। নানা স্থানে ব্যর্থ অন্বেষণ করিয়া আজ মহেশ হোঁদল কুৎকুতে খুঁজিতে মুর্গীহাটায় বাহির হইয়াছিল। সমস্ত দোকান আঁতি-পাঁতি খুজিয়া বেলা তিনটায় একেবারে ডাক্তার সঙ্গে করিয়া সে ফিরিল।

খোকার তখন চেতনা ছিল ; পিতাকে দেখিয়া দু'টি শীর্ণ হাত বাড়াইয়া সে ক্ষীণ-স্বরে কহিল, "বাবা, হোঁদল কুৎকুতে ?" মহেশ উড়ানীর মধ্য হইতে ভেড়ার লোমে তৈরী একটি পুতুল বাহির করিয়া কহিল, "এই যে বাবা !" পুতুলটি হাতে লইয়া মাখন একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তারপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ধ্যেৎ !" মহেশের মুখ ছোট হইয়া গেল ! ছেলের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে কহিল, "একটু দুধ খাও বাবা ! এখুনি নতুন একটা এনে দেব।" মাখন বিরক্ত হইয়া কহিল, "নাঃ।"

ডাক্তার অনেকক্ষণ দেখিয়া, যাইবার সময় সেই এক কথাই বলিয়া গেলেন, "যেমন ক'রে হোক্ পথ্য দেওয়াই চাই। নৈলে—" তাহার পর কহিলেন, "আজ অমাবস্যা, একটু সাবধানে থেকো মহেশ !"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। ডাক্তার চলিয়া গেলে মাটিতে লুটাইয়া খোকার-মা কাঁদিয়া উঠিল, "বুকের রক্ত দিয়ে তোমার পায়ে আল্‌তা পরাব রাধারাণী। খোকাকে আমার ফিরিয়ে দাও !"

সন্ধ্যা হইতে অনবরত প্রলাপ বকিতে বকিতে খোকা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা-মাতা ভাঙা একটি কেরোসিনের বাক্স পুত্রের চৌকীর কাছে টানিয়া তাহার উপর পাশাপাশি নিস্পন্দ বসিয়া নির্ব্বাক-শঙ্কায় রুগ্ন-পুত্রের দিকে চাহিয়াছিল। স্ত্রী ঘন ঘন অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিল। আর মহেশের সমস্ত অন্তর বিশ্বসংসার মন্থন করিয়া হোঁদল কুৎকুতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সময়ে খোকার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। পিতা-মাতা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শুনিল, খোকা কহিতেছে, "আয় আয়, হোঁদল কুৎকুতে আয় আয়। মহেশের চোখের উপর হইতে একখানি পর্দ্দা যেন সরিয়া গেল। আর একদিনের কথা মনে পড়িল ; সে দিনও এমনি করিয়া হাত নাড়িয়া খোকা 'হোঁদল কুৎকুতে' ডাকিতেছিল। তীর বেগে উঠিয়া মহেশ কহিল, "আমি এখুনি ফিরে আস্‌ছি খোকার-মা ! ভয় পাস্‌নি !"

মাইল-খানেক পথ উদ্‌ভ্রান্তের মত চলিয়া আসিয়া সিঙ্গি-বাবুদের দরজায় যখন মহেশ দাঁড়াইল তখন প্রায় ভোর। দারোয়ান হরবন্‌শ পাঁড়ে ঢুলিতেছিল ; পায়ের শব্দে উঠিয়া বন্দুক ঘাড়ে তুলিয়া কহিল, "কোন্ হায় ?"

মহেশ দারোয়ানের হাত দু'টি ধরিয়া কহিল, "দারোয়ানজী ! বড়বাবুর সঙ্গে মোলাকাৎ—"

দারোয়ান না শুনিয়াই কহিল, "আট্ বাজে।"

মহেশ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আট্‌টা পর্য্যন্ত বাঁচবে না যে দারোয়ানজী।"

মহেশের ক্রন্দনধ্বনি সম্ভবতঃ ভিতরে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। দোতলার গাড়ী-বারান্দা হইতে গম্ভীরশব্দে প্রশ্ন আসিল, "কোন্ হ্যায় দারোয়ান ?"

হরবন্‌শ কহিল, "নেহি জান্‌তা হুজুর ! রোতা হ্যায়।"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে হুকুম আসিল, "লে আও !" বলিতে বলিতে বাবু নিজে মদের গ্লাস হাতে লইয়াই নামিয়া আসিলেন। মহেশ বাগানে ঢুকিয়াই দেখিল স্বয়ং বড়বাবু। সিঙ্গি-বাড়ীর এই ভীষণ প্রকৃতির মালিকটিকে ভয় না করিত এমন লোক সে পাড়ায় কেহ ছিল না। মহেশের সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল, কথা যোগাইল না। সে নীরবে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বড়বাবু তাঁহার বিপুল দেহভার সশব্দে একটি বেঞ্চের উপর নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা শুন্‌চি।"

মহেশের বুক কাঁপিতে লাগিল। তবু সে মাখনের জন্ম-বৃত্তান্ত কহিয়া গেল। কত হত্যা, ধন্না, মানসিক—তার পর পুত্রলাভ। শেষে হঠাৎ এই ব্যাধি। চিকিৎসার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু হইল না। আজই সব শেষ হইয়া যাইবে, তবে বড়বাবু যদি একবার পায়ের ধুলা দেন তাহা হইলে,—এই পর্য্যন্ত কহিয়াই মহেশের গলা ধরিয়া আসিল, আর কিছু বলা হইল না।

গ্লাসটি ঠোঁটের কাছ হইতে নামাইয়া বড়বাবু কহিলেন, "আমি গেলে কি হবে ?"

তখন খোকার বায়না হোঁদল কুৎকুতের কথা সবিস্তারে মহেশ কহিল। তার পর কহিল, "সারা সহর এরই জন্যে তন্ন তন্ন করে

খুঁজেছি হুজুর! কাল রাতে হঠাৎ মনে হ'ল—" মহেশ বলিতে গিয়া ভয়ে থামিয়া গেল।

বড়বাবু কহিলেন, "বল।"

মহেশ হাত যোড় করিয়া বড়বাবুর পায়ের দিকে চাহিয়া তাহার অনুমানের কথা কহিয়া গেল। খোকা সেদিন তাহার সঙ্গে সিঙ্গি-বাড়ীতে সখের যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিল। পালায় সে রাত্রে বড়বাবু "হোঁদল কুৎকুতে" সাজিয়াছিলেন। পরদিন হইতেই খোকার জ্বর। বড়বাবুকে দেখিলেই সে ভাল হইয়া যাইবে, সে বড়বাবুকেই দেখিতে চায়।

বড়বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বেশ! চল।"

বড়বাবুকে সঙ্গে করিয়া যখন মহেশ আসিয়া পৌঁছিল, তখন খোকার জ্ঞান ছিল। ছেলের কানের কাছে মুখ লইয়া মহেশ কি যেন কহিল, খোকা দু'টি চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কৈ?"

মহেশ বড়বাবুকে দেখাইয়া দিল।

খোকা বড়বাবুর দিকে চাহিয়া ক্ষীণ-স্বরে কহিল, "হোঁদল কুৎকুতে! এঃ নাঃ।" তারপর আবার মুখ ফিরাইয়া লইল।

বড়বাবু অনেকক্ষণ শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে মাখনের কপালে হাত দিয়া কহিলেন, "আমি হোঁদল কুৎকুতে এনে দেব খোকা, ভয় নেই।"

মহেশের স্ত্রী গলায় আঁচল জড়াইয়া বড়বাবুর পায়ের উপর পড়িয়া কহিল, "অপরাধ নেবেন না বাবা! মা-বাপের মন—"

বেলা সাতটার সময় নিতাই ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিলেন,

যাইবার সময় গম্ভীরমুখে কহিলেন, "বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে, মহেশ! আমি আধঘণ্টার মধ্যে আস্‌ছি। তুমি একটু গরম জলের ব্যবস্থা কর।"

ডাক্তারের মুখের ভাব দেখিয়া মহেশের বুকের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। স্ত্রী রান্নাঘরে ছিল, তাহাকে ডাকিতে যাইবে, এমন সময় দরজার সম্মুখে বড় গাড়ী থামিবার শব্দ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে, "হোঁ হোঁ-দল কুৎকুতে!" বলিয়া সিঙ্গি-বাড়ীর বড়বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমস্ত মুখে আলকাতরা তাহাতে তূলার পটী, মাথায় গাধার টুপী, গায়ে যাত্রার সংয়ের সেই সাতরঙ্গা ছেঁড়া চাপকান। মহেশ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। খোকা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া দুই হাতে তালি দিয়া হাসিয়া কহিয়া উঠিল, "আয়! আয়! হোঁদল কুৎকুতে আয়! আয়!"

বড়বাবু দুই হাতে খোকাকে বুকে তুলিয়া ছেঁড়া চাপকানটির পকেট হইতে এক গোছা আঙ্গুর বাহির করিয়া খোকার হাতে দিয়া কহিলেন, "খাও বাবা!"

আধঘণ্টা পর নিতাই ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া অবাক হইয়া দেখিলেন, সিঙ্গি-বাড়ীর বড়বাবুর কোলে বসিয়া খোকা গল্প করিতে করিতে আঙ্গুর খাইতেছে। আর মহেশ ও খোকার-মা হাতযোড় করিয়া ঘরের কোণে প্রসন্নমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

জুয়াড়ী

সেদিন প্রাতে তিনহাটির মেলায় জুয়াড়ীদের বৈঠক বসিয়াছিল, বৈঠকের বিচার্য্য বস্তু ছিল জনৈক হিন্দুস্থানী জুয়াড়ী। কাল রাত্রে কোনো হতভাগ্যকে খেলায় নিঃস্ব করিয়া পরে তাহার সহসা করুণার উদ্রেক হয়; সে তাহাকে পাথেয় বাবদ দুই টাকা দিয়া বিদায় করে। কথাটি রটিতে বিলম্ব হইল না এবং অতি-অল্পক্ষণের মধ্যেই এই পরম দয়ালু হিন্দুস্থানী জুয়াড়ীর ছকে খেলোয়াড়দের ভিড় জমিয়া গেল। অন্যান্য জুয়াড়ীদের তাহা সহিল না; তাহারা তাহাদের সর্দ্দার সতীশ কর্ম্মকার ওরফে সতু জুয়াড়ীর কাছে গিয়া নালিশ করিল। তাহার ফলে আজিকার বৈঠক।

ভকত জুয়াড়ীর অবৈধ আচরণের দণ্ডের ব্যবস্থা লইয়া জুয়াড়ী-দের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছিল, তখন সতীশ আসিয়া পৌছিল। অতি শীর্ণকায়, দীর্ঘদেহ, কৃষ্ণবর্ণ—গলায় তুলসীর কণ্ঠী।

ভকতকে দেখিয়াই রক্ত-চক্ষু আরও আরক্ত করিয়া সতীশ কহিল, "কি হে দয়াময়!"

ভকত বিদ্রূপ বুঝিল না, বলিল, "হাঁ সর্দ্দারজী! দয়া করবার লাগে। তুলসীদাস জীনে—"

"বেটা ছাতুখোর! খেলতে এসেছিস্ হ্যা—তুলসীদাসে তোর কাজ কিরে বাপু?"

এবার ভকত বুঝিল। তখন তুলসীদাস ছাড়িয়া সে একেবারে গুরু নানকের দোঁহা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল।

সতীশ ধমক দিয়া কহিল, "শোলোকে বল্‌তে হয় ঠাকুর টিকিতে ফুল গুঁজে ঠাকুর-বাড়ী যাও। দয়া করতে গেলে এ মেলা ছাড়তে হবে!" বৎসরের খোরাক এই মেলা হইতেই ভকত যোগাড় করে—মেলা ছাড়িলে, অন্ন মিলিবে না।

ভয় পাইয়া ভকত কহিল, "কসুর মাপ করিও সর্দ্দারজী, আর এ্যায়সা হোবে না।"

সতীশ খৈনির ডেলাটি মুখে ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা! যাও জরিমানা দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা।"

ভকত বাঁচিয়া গেল, কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া আছে সর্দ্দারজী—টাকা আমি নিয়ে আস্‌ছি।" ভকত চলিয়া গেল।

সতীশ সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—"জুয়াড়ীর দয়া! ভূতের মুখে রাম নাম আর কি?" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সতীশ কহিল, "যা হোক! আজ অমাবস্যার পূজা, লোকের ভিড় হবে। দু'-এক পয়সার দান কেউ খেলবে না। দু'-আনা থেকে সুরু। বুঝ্‌লে সব?" সকলে বিনা বাক্যে সতীশের আদেশ মানিয়া লইল। সতীশ চলিয়া গেল।

তিনহাটির মেলায় সতীশের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। মেলার

মালিকও তাহাকে খাতির করিয়া চলিতেন। কারণও ছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল, পৈত্রিক স্বর্ণকারবৃত্তি ছাড়িয়া সতীশ জুয়ার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল এই মেলাতেই। তখনও মেলার শৈশব অবস্থা। এই জমিদারের সহিত সতীশের পরিচয় হয়। পর বৎসর জমিদারের নির্দ্দেশক্রমে মেলায় খেলিবার জন্য সতীশ একদল জুয়াড়ীর আমদানী করিল। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই মেলা জাঁকিয়া গেল, সতীশের প্রতিষ্ঠার অন্ত রহিল না। লোক সংক্ষেপে তিনহাটির মেলার নাম দিয়াছিল, "জুয়ার মেলা"। প্রকৃত পক্ষে দোকান-পসারের অর্দ্ধেক ছিল জুয়ার দোকান। আর মেলার এই অংশের প্রাণস্বরূপ ছিল সতীশ। জুয়াড়ীদের সুখ-সুবিধা দেখিবার ভার ছিল তাহার উপর—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা—দারোগা-সিপাহীদের পার্ব্বণী আদায় করা প্রভৃতি কাজ সেই করিত। এই একমাস তাহার বিশ্রাম রহিত না। শুধু পুত্র হরিদাসের কথা মনে হইলে সেদিন আর সতীশের খেলা জমিত না; বৎসর তেরো পূর্ব্বে একদিন এই তিনহাটির মেলাতেই সে তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া ঘরে ফিরিয়াছিল। ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছিল বহুদিন, কিন্তু আজও স্মৃতির বিন্দুমাত্র আঘাতে তাঁহা হইতে রক্ত ঝরিত।

অমাবস্যা। মেলায় রক্ষাকালী পূজা, দারুণ ভিড়। চারিপাশে কতকগুলি লোহার চেয়ার, তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড একটী চৌকিতে ধোপদস্ত চাদর পাতা, দুই পাশে দুইটি ফুলদানী, মধ্যে একটি বার-কোষে পানের খিলি ও বিড়ি, মাথার উপরে মোমবাতির ঝাড়—এই সরঞ্জাম লইয়া সন্ধ্যা হইতেই সতীশ তাহার জুয়ারআসর পাতিয়া

বসিয়াছিল। এই দিনে মেলার জমিদার ও চারি পাশের পল্লীর সম্পন্ন-ব্যক্তিরা সতীশের ছকে জুয়া খেলিতেন। পূর্ব্বে ইহা নিতান্তই সখের ব্যাপার ছিল; সম্প্রতি বার্ষিকে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সতীশের নিমন্ত্রিত খেলোয়াড়ের দল তখনও আসিয়া পৌছেন নাই; কিন্তু দোকানের চারি পাশে ভিড় কম ছিল না। অনেকগুলি দর্শক দাঁড়াইয়া সতীশের খেলা আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা কেন দাঁড়াইয়া আছে সতীশ তাহা জানিত, তথাপি কহিল, "তোরা দাঁড়িয়ে ভিড় জমাস্ কেন? খেল্‌তে পারবি নে—বড়দানের খেলা আজ!"

সম্মুখের লোকেরা কেহ কিছু কহিল না, কিন্তু পিছন হইতে একজন ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিল, "পারব না—বটে! কেন? পয়সা নেই—আমাদের, না?"

সতীশ অপাঙ্গে এবার লোকটাকে দেখিয়া লইল। তাহার গায়ে লাল ফুলদার কামিজ, গলায় নানা বর্ণের ও উলের কম্ফর্টার, সদ্য-তৈলাক্ত চুলে ঢেউ তোলা সিঁথি, কোমরে জড়ানো বেগুনী রংয়ের একখানা ফুলদার আলোয়ান। সতীশকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই হাতের ডবলস্প্রিংয়ের ছাতিটা কাঁধের উপর ফেলিয়া সে পুনরায় কহিল, "চাষার পয়সা নেই বুঝি, না? খেলা লাগাও।"

সতীশ বুঝিল লোকটি সদ্য কিছু পাট বেচিয়া আসিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া কহিল, "বোস তবে মণ্ডলের-পো! তোমার হাতেই বৌনি হোক্! নাও ধর থিলি, বিড়ি নাও।"

খেলা সুরু হইল। প্রথম প্রথম দুই চারি দান সতীশ হারিল।

মণ্ডলের পুত্র হাসিয়া কহিল, "এইবার বড়দান লাগাও জুয়াড়ী ভাই!" আরও জনকয়েকের খেলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহাদের সম্বল ছিল অল্প—মণ্ডলেব পুত্রের প্রস্তাবে তাহারা আপত্তি জানাইল।

সতীশ হাসিয়া কহিল, "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। কি কর্ব্ব? টাকা টাকা দান।"

মণ্ডলের পুত্র কহিল, "উঁহু! পাঁচ টাকা।"

সতীশ মনে মনে হাসিল, মুখে কহিল, "রাজী। তোমার হাতেই ফকীর হ'লাম দেখ্‌ছি?"

খেলা চলিল। পাঁচ টাকার দান ক্রমে দশ টাকায় উঠিল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই মণ্ডলের পুত্রকে নিঃসম্বল করিয়া সতীশ হাসিয়া কহিল, "কেমন? আর কই?"

মণ্ডলের পুত্রের মর্য্যাদায় আঘাত করিল। কোমর হইতে আলোয়ানখানি খুলিয়া জুয়ার ছকের কোণে রাখিয়া কহিল, "শেষ দান!"

বলা বাহুল্য, শেষ-দানেও মণ্ডল-পুত্রের ভাগ্য ফিরিল না।

বিবর্ণমুখে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া মণ্ডলের-পো কহিল, "আচ্ছা কাল হবে আবার!"

আলোয়ানখানি ভৃত্য গণেশের হাতে দিয়া সতীশ কহিল, "বেশ ত। আজ ধুনী জ্বেলে দেহটা একটু তাতিয়ে রেখো।"

অপমানে মণ্ডল-পুত্রের চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল—কথা না কহিয়া ভিড় ঠেলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার দিকে চাহিয়া সতীশ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিল। তাহার পর সম্মুখের

জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তোরা যদি না খেলিস্ তবে ভিড় করিস্‌নে—বাবুরা আস্‌বেন। না, এলেন বুঝি—সরে দাঁড়া সব।"

জমিদারবাবুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পল্লীর ভদ্র-সন্তানেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সতীশ উঠিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া সকলকে বসিতে অনুরোধ করিল। দুই একটী সাধারণ কথার পর খেলা আরম্ভ হইল।

টাকার খেলা! তামার সম্পর্ক নাই! পাঁচ-পাঁচ টাকা দান; প্রকাণ্ড জুয়ার ছকখানিতে শুধু টাকা—এক মুহূর্ত্তে শূন্য হইয়া যায়, পর মুহূর্ত্তে ভরিয়া উঠে। এত টাকা কোথা হইতে আসে, পিছনের লোকগুলা বিস্ময়ে তাহাই ভাবিতেছিল। রৌপ্যচক্রের ঝণৎধ্বনি ভিন্ন আর কোন শব্দ ছিল না, শুধু মাঝে মাঝে সতীশের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল,—"মার দান! ডবল!"

ভিড়ের মধ্যে পুত্র হারানিধির হাত ধরিয়া রাখাল কেরাণী খেলা দেখিতেছিলেন। সম্মুখের জুয়ার ছকখানির দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষু ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছিল, শুধু টাকা—এত টাকা! এক সঙ্গে দেখিবার সৌভাগ্য রেজেষ্ট্রী আফিসের কেরাণী রাখাল ঘোষালের এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

* * * *

রাত্রি প্রায় দশটা তখন খেলোয়াড়েরা উঠিলেন। সতীশ আপ্যায়ন করিয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিল। ভকত জুয়াড়ী

সংবাদ লইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সর্দ্দারজী! চিড়িয়া উড়্ গেল?"

সতীশ ছকের কোণের টাকার পুঞ্জ দেখাইয়া সংক্ষেপে কহিল, "আর দম নেই। ছেড়ে দিলাম।" বলিয়া সম্মুখের লোক-গুলাকে ডাকিয়া কহিল, "খেলোয়াড় আছিস্ কেউ, না ছক তুল্‌ব?"

দুই একজন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রাখাল কেরাণী হারুর হাত ধরিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বোস্ হারু একটুখানি। একদান খেলি।"

সতীশ চোখ তুলিয়া কহিল, "কে? কেরাণীবাবু দেখ্‌ছি যে?"

ইতিপূর্ব্বে দুই একবার সতীশ রাখাল কেরাণীকে দিয়া মনিঅর্ডার লিখাইয়া লইয়াছিল; সেই হইতে অল্প পরিচয় ছিল।

রাখাল কেরাণী কহিলেন, "হাঁ, খেলি একদান, কি বল?"

"খেলবেন বৈকি? আপনাদের ভরসাতেই আসা, বসুন।"

"কম থেকেই সুরু করি, কি বলিস্ হারু?" হারু কোন পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না।

রাখাল কেরাণী হাঁকিলেন, "দু'-আনা—লাল পান।"

"তাই তো বরাত ভাল দেখছি আপনার—ডবল উঠেছে।" সতীশ দান তুলিয়া দেখাইল।

রাখালবাবু বিড়িতে আগুন দিয়া কহিলেন, "লাল পান আবার।"

সতীশ দান তুলিল, কেরাণীবাবু জিতিয়াছেন।

রাখাল হাসিয়া কহিলেন, "বরাৎ জুয়াড়ী-ভাই, বরাৎ!"

সতীশও হাসিল, কিন্তু রাখালবাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না। খেলা চলিতে লাগিল। প্রত্যেক দানই রাখাল জিতিতেছিলেন। তাঁহার পাতা রুমালের উপর পুঞ্জীকৃত সিকি-দুয়ানিগুলি হারু নাড়াচাড়া করিতেছিল, এমন সময় সতীশ কহিয়া উঠিল, "দানে মেরেছি ঠাকুর! চিড়িতন খতম।"

রাখালবাবু বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হইয়া কহিলেন, "চিড়িতন আবার। এক টাকা!"

"আবার খতম!" সতীশ হাঁকিল।

"বারবার তিনবার। দু'-টাকা!"

সতীশ হাসিয়া কহিল, "হবে না ঠাকুর! চিড়িতনে ঘুঁটির আড়ি।" দেখুন। চিড়িতন নাই।

এবার রাখালবাবুর মাথায় খুন চাপিয়া গেল। চিড়িতনে খেলিয়া চলিলেন। ধধূপ যেমন উর্দ্ধগতিতে মেঘলোকে উঠিয়া পরক্ষণেই দ্রুততর বেগে নীচে নামিতে থাকে, রাখালবাবুর ভাগ্যও তেমনি নামিতে লাগিল।

সতীশ কহিল, "এইবার ছুটি হোক্ কেরাণীবাবু!"

রাখাল রুখিয়া কহিলেন, "উঁহু! সে হবে না! শেষ না দেখে—" বলিয়া অবশিষ্ট পয়সাগুলি মুঠা করিয়া চিড়িতনের কোঠায় রাখিতে যাইবেন, এমন সময় হারু দুই হাতে পিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আর খেলো না বাবা!"

রাখাল হারুকে ধমক দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন।

সতীশ একবার হারুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলে বুঝি! বড্ড রোগা দেখ্‌চি যেন?"

"হুঁ!" এই সাতমাস জ্বরে ভুগে উঠেছে। যাক্‌গে তোল দান।"

সতীশ ঘুঁটি চালিতে গিয়া থামিয়া কহিল, "আর খেলবেন না কেরাণীবাবু! ঘরে যান।"

রাখাল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "সে হবে না। হয় সব দিয়ে যাব তোমার ছকে, নৈলে—"

সতীশ নীরবে ঘুঁটি চালিল, তিন জাহাজ! চিড়িতন নেই! রাখালের মাথার মধ্যে ওলট-পালট হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল যেন সতীশের জুয়ার ছকখানি তাহার দিকে চাহিয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বন্ধ করিয়া রাখালবাবু কহিয়া উঠিলেন, "আর একদান! দে তো হারু, টাকা দু'টো।"

হারু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রাখাল গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "টাকা দে হারামদাজা!"

হারু কাঁদ কাঁদ হইয়া চাদরের খুঁট পিতার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, "পূজোর টাকা যে বাবা।"

"হোক্! দে টাকা! বলিয়া রাখাল মুহূর্ত্তের মধ্যে টাকা দু'টি বন্ধনমুক্ত করিয়া ছকের উপর রাখিয়া কহিলেন, "আবার চিড়িতন! লাগাও।"

সতীশ নীরবে টাকা রাখালের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, "হবে না ঠাকুর! এবারও চিড়িতন খতম্। ফিস্‌দানে খেলো।"

"যায় যাবে, তোল দান!" রাখাল চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সতীশ ম্লান হাসিল, তারপর ঘুঁটি চালিয়া ঢাকা তুলিতে গিয়া আবার কহিল, "দান তুলে নাও ঠাকুর!".

"মিছে দেরী কোরো না। তোল—" রাখাল রুদ্ধ-নিশ্বাসে কহিলেন, ঢাকা তুলিতে।

সতীশের হাত কাঁপিয়া গেল, সে মৃদুস্বরে কহিল, "দুই লাল পান, এক জাহাজ, চিড়িতন নেই ঠাকুর!"

মুহূর্ত্তকালের জন্য রাখালের মুখখানা পাংশু হইয়া গেল। কোনো ক্রমে উঠিয়া হারুর হাত ধরিয়া কহিলেন, "চল্ হারু।"

সতীশ উঠিয়া হারুর হাতে টাকা দুইটি গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "ও পূজোর টাকা নিয়ে যাও খোকা।"

হারু টাকা দুইটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পিতার সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল, সতীশের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

সতীশ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কি জিদ্! বাপরে! যাক্‌গে —তুই দান চাল গণ্‌শা, আমি একটু জিরিয়ে নিই।"

* * * *

তখন চাষার দল খেলা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। গণেশ খেলিতেছিল। সতীশ কম্বল মুড়ি দিয়া একপাশে কাৎ হইয়া

পড়িয়াছিল, সহসা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, "ও কিসের আওয়াজ রে গণ্শা ?"

"বলির বাজনা বাজ্ছে বুঝি।" দান চালিতে চালিতে গণেশ কহিল।

সতীশ নিঃশব্দে নামিয়া পূজা-মণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল।

সেই প্রতিমা, সেই চত্বর, সেই মেলা! বহু পুরাতন কথাটি মনে পড়িয়া গেল। এমনই একটী দিনে পুত্র হরিদাসের মানৎ শোধ দিবার উপলক্ষ করিয়া এই মেলায় সে প্রথম আসিয়াছিল। জুয়ার ছকে যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া জুয়াড়ীর নিকট তুইটি টাকা সে ভিক্ষা চাহিয়াছিল, পায় নাই।

পরদিন পুত্র হরিদাস অকস্মাৎ জন্মের মত ফাঁকি দিয়া গেল। পর বৎসর সতীশ মেলায় আসিল জুয়াড়ী হইয়া। বারো বৎসর আগেকার কথাগুলি বড় স্পষ্ট হইয়াই আজ মনে পড়িতেছিল। ভোগের বাজনা বাজিল, সেই সঙ্গে সতীশ স্পষ্ট শুনিল, হরিদাস কহিতেছে—

"পূজোর টাকা বাবা!"

* * * *

মেলার মণ্ডপে পূজোর বাজনা অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। ভাঙা ঘরখানির দাওয়ায় একটি কেরোসিন ল্যাম্পের সম্মুখে তুই হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া রাখাল কেরাণী অপরাধীর মত নীরবে বসিয়াছিলেন। আঙ্গিনায় স্ত্রী মাতঙ্গিনী হারুকে প্রাণপণ-বলে

বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতেছিলেন, "এবারকার মত ঘেন্না-ঘেন্না ক'রে রেখে যেও মা! আস্‌ছে বার বুক চিরে রক্ত দিয়ে পূজো দেব!" মায়ের সঙ্গে হারুও কাঁদিতেছিল।

এমন সময় নিঃশব্দে আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া কে হাঁকিল, "বাড়ীতে আছ ঠাকুর?'

রাখাল কেরাণী চমকিয়া উঠিলেন, অকস্মাৎ সতীশ-জুয়াড়ীকে দেখিয়া তাঁহার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সতীশ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সন্ত্রস্ত মাতঙ্গিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথার ঝাঁকা মাটিতে নামাইয়া কহিল, "প্রসাদ নাও মা। খোকার মানৎ দিয়ে এলাম, পূজোর টাকা রেখে ঠাকুর যে কোন দিক দিয়ে—" বলিয়াই সে রাখাল কেরাণীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর হারুর হাত ধরিয়া কহিল, "মাকে বল খোকা, আজ এখানেই দু'টো প্রসাদ পাবো।"

পরদিন প্রাতে জুয়াড়ীর দল সবিস্ময়ে দেখিল যে, জুয়ার ছকখানি গুটাইয়া সতীশ নীরবে বসিয়া আছে।

দীনু-জুয়াড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ওস্তাদ?"

সতীশ ম্লানহাস্তে কহিল, "আর খেলা হবে না দাদা! সব হেরে গেছি।"

বলা বাহুল্য, সে কথা কেহ বিশ্বাস করিল না।

ঊর্দ্ধ্বরেখা

ননী হাল্‌দার ও মাখন বিশ্বাস উভয়েই ক্যাপিটাল খুঁজিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে পরিচয়ও ছিল না; ননী হাল্‌দার শ্যামবাজারে একটি ছোট ষ্টীল ট্রাঙ্কের দোকানের পাশে অতি ছোট একখানি ত্রিকোণ কামরা ভাড়া করিয়া দরজায় সাইনবোর্ড লট্‌কাইয়া দিয়াছিলেন, "বৃহৎ জ্যোতিবিজ্ঞান বিদ্যালয়। ফলিত-জ্যোতিষ, গণিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে নির্ভুল গণনা। পরীক্ষায় পাশ-ফেল, রেশের হার-জিত, ব্যবসায়ে উন্নতি-অবনতি বিষয়ে বিশুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী। অধ্যাপক জ্যোতিষী শ্রীননীগোপাল হাল্‌দার, জ্যোতিরত্ন-বাচস্পতি।" ছিদাম ময়রার লেনের বিখ্যাত কস্‌মো-পলিটান্ ফেডারেটেড্ হোমিও ইউনিভার্সিটি হইতে এম্-বি (হোমিও) পাশ করিয়া ননী হাল্‌দার শা'পুরে প্রথমে চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন, কিন্তু মূলধনের অভাবে তাহা চলিল না। কলিকাতায় জ্যোতিষীর ব্যবসায়ে সহজে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন স্থির করিয়া অতঃপর তিনি সহরে আসিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহিগুলি বাঁধাইয়া তাহার পিছনে সোণার হরফে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রচলিত ও অপ্রচলিত সুলভ ও দুর্লভ বহির নাম

লিখাইয়া লইলেন। একটি ভাঙা আলমারি মেরামত করিয়া তাহার উপরের তাকে সেগুলি সাজাইয়া নীচের তাকে রাখিলেন। খান-ত্রিশেক পুরাতন পঞ্জিকা। আলমারি ছাড়া ঘরের আসবাব একখানা তক্তাপোষ, তাহার উপর একখানি ছেঁড়া সতরঞ্চি পরিষ্কার বোম্বাই চাদর দিয়া ঢাকা। ফরাসের উপর একখানা পেষ্টবোর্ডে করতলের একটি নক্‌সা ও একটি ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস।

মাখন বিশ্বাস ঘরভাড়া লইয়াছিলেন ভবানীপুরে। অভিরাম ত্রিপাঠীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলের ৬ ফুট×৪ ফুট একতলার একটি কামরা ভাড়া করিয়া মাসখানেক হইতে বাস করিতেছিলেন। দালালী ব্যবসায়ে কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া অবশেষে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন—সেই সঙ্গে 'সৌভাগ্য-মাদুলী' ও 'ভাগ্যোদয় কবচে'র কারবার করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। ক্যাপিটাল জুটিয়াও জুটিতেছিল না। সতেরো নম্বরের বাড়ীখানির একটা গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিলেই হয়! গ্রাহকেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু কোন ক্রমেই দেউড়ীর দরোয়ানকে এড়াইয়া মাখন বিশ্বাস ভিতরে ঢুকিতে পারিলেন না। একখানি মোটর গাড়ীও বিক্রয়ের জন্য ছিল। দিন কয়েক এক সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে হাঁটাহাঁটি করিয়া মনে মনে বলিবার কথাগুলি স্থির করিয়া লইয়া মাখন বিশ্বাস ভিতরে ঢুকিয়াছিলেন বটে; কিন্তু দূর হইতে সাহেবের চেহারা দেখিয়াই তাঁহার বুকের পুরাতন স্পন্দন ব্যাধিটা বাড়িয়া উঠিল—তিনি একেবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। দমদমার বাগানবাড়ীটার খরিদ্দার জুটাইয়া দিতে পারিলে এক

থোক পাঁচ হাজার টাকা মিলিয়া যায়। বাগানবাড়ীর মালিকও অনবরত তাগিদ দিতেছিল—তিন-চার দিনের মধ্যে তাঁহার বাড়ী বিক্রয় হওয়া চাই-ই, নতুবা তিনি অন্য দালাল দেখিবেন। মাখন বিশ্বাস প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, কাশীপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানের সম্ভব-অসম্ভব সর্ব্বপ্রকার খরিদ্দারের বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া যানে এবং পদব্রজে ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিলেই বুকের ব্যাধিটা দেখা দিত; অবশেষে দুই টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া বুক দেখাইলেন এবং সাড়ে-এগারো আনায় প্রেসক্রপসন অনুযায়ী ছয় দাগ ঔষধ আনাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিয়া প্রাতে বুকে হাত দিয়া অনুভব করিলেন যে, ব্যাধিটা অনেক কম পড়িয়া আসিয়াছে, অতএব তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া মাখন বিশ্বাস মহারাজ সম্পৎ রায়ের বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ সম্পৎ রায় একটি বড় বাগানবাড়ী খুঁজিতেছেন—এ কথা মাখন বিশ্বাস গত সন্ধ্যায় শুনিয়াছিলেন ট্রামে।

রাজবাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাখন বিশ্বাস বুকে হাত দিয়া দেখিলেন যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা স্বাভাবিক। চোখ বুজিয়া দেউড়ীর দরোয়ানকে এড়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া আর একবার বুকে হাত দিলেন, দেখিলেন অবস্থা পূর্ব্ববৎ। মনে সাহস হইল, কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে মাখন বিশ্বাস বরাবর ড্রয়িংরুমে গিয়া ঢুকিলেন। সেখানে প্রথমেই মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী বলদেও

প্রসাদের সহিত তাঁহার দেখা হইল। বলদেও প্রসাদের ঢেউতোলা, টেরী, বিরাট গোঁফ, হীরা-বসানো সোণার বোতাম, জরির নাগরা ও আরক্ত-চক্ষু দেখিয়া মাখন বিশ্বাসের বুকের ব্যাধিটা দেখা দিবার উপক্রম করিতে লাগিল। সেক্রেটারী মাখন বিশ্বাসের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং উত্তরে হিন্দি, ইংরাজী ও বাঙ্গালা তিন ভাষার সমাবেশে কি বলিলেন তাহা তাঁহার মনে রহিল না। কিছুকাল পর মাখন বিশ্বাস দেখিলেন যে, তিনি সদর রাস্তায় বুকে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রাজবাড়ীর সিংহদ্বারের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছেন।

হঠাৎ আপনার হৃৎপিণ্ডটার উপর মাখন বিশ্বাসের দারুন ক্রোধ জন্মিয়া গেল। সাহেব ডাক্তারের দ্বারা হৃৎপিণ্ডকে সমুচিত শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়া তিনি পথ ধরিলেন। মোড় ফিরিতেই বৃহৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড চোখে পড়িল; মাখন বিশ্বাস থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভাবিলেন সর্ব্বপ্রথম অদৃষ্ট-বিচার করানোই সঙ্গত। কারণ, অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে সাহেব-ডাক্তার ডাকিয়া হৃৎপিণ্ডের জন্য ষোল টাকা ব্যয় করা একেবারেই অনর্থক। এই ভাবিয়া তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে ঢুকিলেন,—ননী হালদার গম্ভীর-মুখে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে ফরাসের একটি কোণ দেখাইয়া কহিলেন, "বসুন।"

এইরূপে মূলধনের দুই সন্ধানীর পরিচয় হইল।

* * * *

ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস চোখে দিয়া মাখন বিশ্বাসের প্রসারিত দক্ষিণ করতলের দিকে চাহিয়া ননী হাল্‌দার কহিলেন, "উচ্চস্থান" হইতে পতন। আপনি কখনও উপর থেকে পড়েছিলেন কি?"

মাখন বিশ্বাস অতীত জীবনটি একবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেলেন। গত বৎসর গ্রামের বারোয়ারী তলায় "প্রফুল্লের" অভিনয়ে যোগেশ সাজিয়া জ্ঞানদাকে পদাঘাত করিবার সময় অভিনয়ের বংশমঞ্চ ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়িল, কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনার পিতা—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মারা গেছেন।"

"আহা!! আপনি বল্‌বেন না, সে তো আমিই বল্‌ব। মারা গেছেন? কত বয়সে?"

"এই পঞ্চাশ-একান্ন!"

"উঁহু! বায়ান্ন বৎসর একমাস তাঁর পরমায়ু ছিল।"

"আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস কর্‌ব।"

"কর্‌বেন। এখন আপনার ভবিষ্যৎ—"

"বলুন! তাই শুন্‌তেই আসা। বড় মুস্কিল!"

"কিছু বল্‌বেন না, আমিই বল্‌ব। মুস্কিলও আছে, আশানও আছে, ভয় পাবেন না চমৎকার ঊর্দ্ধরেখা দেখ্‌ছি।"

"সবই তো আছে, কিন্তু বুকের ব্যাধিটা—"

ননী হাল্‌দার চক্ষু একটু নিমীলিত করিয়া কহিলেন, "ওটা ব্যাধি নয় যন্ত্রণা। বেদনা করে, কাঁপেও, দমও আটকায়, কেমন?"

"আজ্ঞে কাঁপুনিই বেশী," মাখন বিশ্বাস কহিলেন।

"হ্যাঁ তা জানি, এই দেখুন এইটে হচ্ছে হৃদ্-রেখা কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠেছে। কাঁপুনিটা কি সন্তঃ হয়েছে না বরাবর ছিল?"

মাখন বিশ্বাস আবার একটু ভাবিয়া দেখিলেন। ইস্কুলে থার্ড মাষ্টারকে দেখিলে বুক কাঁপিত। তাহার পর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় অঙ্কের প্রশ্নপত্র পড়িয়া বুক কাঁপিয়াছিল প্রায় আধ ঘণ্টা।

"আজ্ঞে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার সময় খুব একদিন কেঁপেছিল! সে প্রায় দশ বছরের কথা।"

ননী হাল্‌দার গম্ভীর-মুখে কহিলেন, "তার পরও তো কম্পন দেখ্‌ছি। ভেবে দেখুন।"

আর একদিনের কথা মনে পড়িয়া মাখন বিশ্বাসের মুখ লাল হইয়া উঠিল। প্রায় বৎসর পাঁচেক পূর্ব্বে বিবাহের পর ফুলশয্যার রাত্রে নববধূর সহিত প্রথম কথা কহিতে গিয়া তাঁহার দারুণ হৃৎস্পন্দন উপস্থিত হইয়াছিল; সমস্ত রাত্রি আর সে কাঁপুনি থামে নাই। শেষে শীতের দোহাই দিয়া সেই জ্যৈষ্ঠ মাসেও তিনি কাঁথা মুড়ি দিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা কহিতে মাখন বিশ্বাসের বাধিয়া গেল।

ননী হাল্‌দার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "কম্পমান আরও হ'য়েছে এখনও হয়, তবে থাক্‌বে না। যে রকম ঊর্দ্ধরেখা দেখছি তাতে—"

মাখন বিশ্বাস সোৎসাহে কহিলেন, "হবে কি কিছু? না, বুকের কাঁপুনিতেই সব ভেস্তে যাবে?"

"উঁহু! ধনলাভ, ব্যবসায়ে উন্নতি সবই স্পষ্ট দেখ্‌ছি। এই দেখুন ঊর্দ্ধরেখা কম্পন-রেখা ভেদ ক'রে বরাবর তর্জ্জনীর মূলে গিয়ে ঠেকেছে। অচিরাৎ আপনার অর্থলাভ হবে, কাঁপুনিতে আটকাবে না। যা বল্‌লাম নিশ্চিন্ত থাকুন, জ্যোতির্ব্বিদ্ হাল্‌দারের কথা মিথ্যা হয় না। এ পর্য্যন্ত হয়নি!"

মাখন বিশ্বাসের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বাঁচালেন মশাই! আপনার কথা শুনে ভরসা হচ্চে। কথা যদি ফলে সকলের আগে আপনার সঙ্গে দেখা কর্ব্ব।" বলিয়া দু'টি টাকা ফরাসের উপর ননী হাল্‌দারের সম্মুখে রাখিয়া মাখন বিশ্বাস দ্বিতীয় বার নমস্কার করিয়া স্মিতমুখে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * *

ননী হাল্‌দারের সম্মুখে লজ্জায় নিজের করতলের দিকে মাখন বিশ্বাস ভালো করিয়া চাহিতে পারেন নাই, পথে আসিয়া ঊর্দ্ধরেখাটি একবার দেখিয়া লইলেন; স্পষ্ট-রেখা একেবারে সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ তাঁহার বুকে দারুণ বল হইল; ট্রাম আসিতেছিল মাখন বিশ্বাস হাঁকিলেন, "এই বাঁধ্‌কে!"

ট্রামের ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠিয়া মাখন বিশ্বাস নিজের এই সাহসে

নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কোন দিন তিনি ডাকিয়া ট্রাম থামান নাই, বরাবর ছাতি তুলিয়া দাঁড়াইতেন, কোনো ট্রাম থামিত, কোনো ট্রাম থামিত না। আজ ডাকিয়া ট্রাম থামাইলেন অথচ বুক কাঁপিল না, নিশ্চিত শুভ-লক্ষণ! উর্দ্ধরেখার ফল ফলিতেছে!

হোটেলে পৌছিয়াই মাখন বিশ্বাস হুকুম করিলেন, "ঝি গরম জল ক'রে দাও শীগ্‌গির!"

ঝি প্রত্যহের মত আপত্তি জানাইয়া কহিল, "এত বেলায় হবে না বাপু!"

"হবে না! হ'তেই হবে। ঠাকুরকে বল গে, না পারে চায়ের দোকান থেকে নিয়ে আস্থক! রোজ রোজ চালাকি চলবে না।"

ঝি মাখনবাবুর এরূপ মূর্ত্তি আর পূর্ব্বে দেখে নাই। আশ্চর্য্য হইয়া ঠাকুরকে বাবুর হুকুম শুনাইতে চলিয়া গেল।

স্নান করিবার সময় করতল সাবানে পরিষ্কার করিয়া মাখন বিশ্বাস দেখিলেন যে, উর্দ্ধরেখা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বৈকালে দিবা-নিদ্রা সারিয়া কেবল মাখনবাবু বাহির হইলেন, এমন সময় বাগান-বাড়ীর মালিক আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লেন, না অন্য দালাল—"

মাখন বিশ্বাসের মেজাজ এই কথা শুনিয়া হঠাৎ আজ রুক্ষ হইয়া গেল, কহিলেন, "সে যা ইচ্ছা কর্ত্তে পারেন। তবে বাড়ী বেচ্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লে আসবেন একবার সন্ধ্যার পর, দেখ্‌ব।"

বাড়ীর মালিক এক গাল হাসিয়া কহিলেন, "তাহ'লে কিছু করেছেন বলুন! আপনার মুখ দেখে—"

"সে পরে শুন্‌বেন মশাই, এখন বেরোচ্ছি কথা বলবার সময় নেই।" বলিয়া মাখনবাবু ট্রামের সন্ধানে চলিলেন।

মহারাজ সম্পৎ রায়ের দেউড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাখনবাবু একবার বুকে হাত দিলেন, বুক কাঁপিতেছে না। দক্ষিণ করতলও দেখিয়া লইলেন। মনে হইল ঊর্দ্ধরেখাটি যেন রাজবাড়ীর দেউড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর মহারাজ সম্পৎ রায়ের দোতালায় গিয়া উঠিয়াছে। দেউড়ী দিয়া ঢুকিয়া ড্রয়িং-রুমে গিয়া মাখনবাবু চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। সেক্রেটারী বল্‌দেও প্রসাদ ঘরের কোণে টাইপরাইটারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহারাজের লেডী টাইপিষ্টকে সম্ভবতঃ কোনও উপদেশ দিতেছিবেন, বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কেয়া মাঙ্গ্‌তা ?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে মাখনবাবু প্রথমে একবার বুকে হাত দিলেন। তারপর দক্ষিণ করতল দেখিয়া লইবেন, সব ঠিক্ আছে। কহিলেন, "মহারাজের সঙ্গে দেখা কর্ব্ব।"

"আপনার কি কাজ আছে ?"

"কাজ আছে, তাঁকে বল্‌ব।"

বলদেও প্রসাদ চাপরাশীকে কহিলেন, "কার্ড ভেজো।"

অনতিবিলম্বে মাখন বিশ্বাসের কার্ড চলিয়া গেল। মাখনবাবু টেবিলের নীচে করতল প্রসারিত করিয়া মাতার মত স্নেহসিক্ত-দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধরেখাটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাজের 'সেলাম' আসিল; চাপরাশীর সহিত উপরে উঠিয়া দূর হইতে মাখনবাবু একবার মহারাজকে দেখিয়া লইলেন। তাঁহার

গোঁফ সেক্রেটারীর গোঁফ অপেক্ষাও জম্‌কালো, তবু বুক কাঁপিতেছে না, ইহা স্পষ্ট মাখনবাবু অনুভব করিলেন, মহারাজকে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মাখন বিশ্বাসের বুক একটু কাঁপিল, তখনই একবার চট্‌ করিয়া করতল দেখিয়া লইলেন, ঊর্দ্ধরেখা একেবারে কম্পনরেখাকে ভেদ করিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ননী হাল্‌দারের একটি কথা কানের মধ্যে ঢাক পিটাইতে লাগিল, "ননী হাল্‌দারের কথা মিথ্যা হয় না।"

মাখনবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মহারাজকে নমস্কার করিলেন।

মহারাজ কহিলেন, "আপনি হচ্ছেন বাবু মাখনলাল বিশোয়াস্‌, হাউস্‌-এজেণ্ট্‌?"

"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ!"

"বাড়ী হোবে খোঁজে? বাগান-বাড়ী? গ্যারেজ, আস্তাবল, লিচির বাগান, তালাও?"

"আছে মহারাজ! হুকুম হ'লে দেখাতে পারি।"

"হামি দেখ্‌ব। চেয়ার লিন্‌, বসুন।" মহারাজ কক্ষান্তরে গেলেন।

বস্তুতঃ মহারাজ সম্পৎ রায়ের বাগান-বাড়ীর আশু প্রয়োজন ছিল। সিমলায় বড়লাটের নিকট এসেম্বলীর সদস্য পদের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া ফিরিবার সময় লক্ষ্ণৌ হইতে একটি উপসর্গ জুটাইয়া আনিয়াছিলেন। সেটির স্থান দিয়াছিলেন তাঁহার মাণিক-তলার বাগান-বাড়ীতে। সংবাদটি সন্ধ্যাকালেই অন্দরে গেল, এবং পরদিন প্রভাতে মহারাজ শুনিলেন যে, মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে

অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য মহাদেওজী স্বপ্নে মহারাণীর নিকট বিশেষ জিদ্ করিয়াছেন। অতএব অবিলম্বে বাগান-বাড়ী গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার ও পবিত্র করিয়া দিতে হইবে। এত স্থান থাকিতে সহসা মাণিকতলার বাগান-বাড়ীর উপর শিবঠাকুরের লোভ কেন হইল, মহারাজ তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিপদ্ গণিয়া সেক্রেটারীকে তলব করিলেন ; সেক্রেটারী দুই-একটি বাগান-বাড়ীর মালিকের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিলেন, দাম ঠিক হইল, কিন্তু তাঁহার কমিশনে বনিল না ; কাজেই সেক্রেটারী নূতন বাড়ী অনবরত আসিতে লাগিল। এই নিদারুণ সঙ্কটকালে মাখন বিশ্বাসের সহিত মহারাজ সম্পৎ রায়ের দেখা হইল।

* * * *

সেই রাত্রেই বাগান-বাড়ীর মালিকের সহিত মহারাজের শেষ কথা-বার্ত্তা হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে বাড়ীওয়ালার জমাদার তৃতীয় বার তাগিদ করিয়া যাইবার পর যখন ননী হাল্দার উর্দ্ধে চাহিয়া কড়িকাঠ গণিতেছিল, তখন মাখন বিশ্বাস ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "অভ্রান্ত আপনার গণনা! বুকের কাঁপুনি মোটেই নেই, সম্ভবতঃ উর্দ্ধরেখা কম্পন-রেখা ভেদ ক'রে উঠে পড়েছে।"

ননী হাল্দার একটু বিমর্ষ-হাস্যে কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহাকে বাধা দিয়া মাখন বিশ্বাস কহিলেন, "উর্দ্ধরেখার প্রথম ফল

ফলেছে, তার যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা এই রহিল!” বলিয়া একশো টাকার পাঁচখানা নোট ফরাসের উপর রাখিয়া মাখন বিশ্বাস বাহিরে মহারাজ সম্পৎ রায়ের মোটরে গিয়া উঠিয়াই হাঁকিলেন, “ভবানীপুর!”

বৃহৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডের উল্টা পিঠে ন্যাশনাল্ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসীর বিজ্ঞাপন লিখিতে দিয়া এবং বহিগুলি প্যাক্ করিয়া সেই রাত্রেই ঘর-ভাড়া করিতে ননী হাল্‌দার দ্বারভাঙ্গা যাত্রা করিলেন।

ট্যারা

বছর ষোল আগেকার কথা। তেতাল্লিশ নম্বরের কলেজ মেস। সারারাত্রি অভিনয়দর্শনে রক্তচক্ষু রামহরিবাবু সকাল বেলায় ডাকের চিঠিখানা খুলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হুররে!"

পাশের ঘরে দিগম্বরবাবু মোক্তারী পরীক্ষার নোট মুখস্থ করিতে-ছিলেন, ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার?

"সুখবর হে, সুখবর! গৃহিনী—"

"খাওয়াও তাহ'লে! ছেলে হ'য়েছে?"

রামহরিবাবু আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পুত্র নয় হে, কন্যা। তবু খাওয়াব, ছেলেমেয়ের কোনো তফাৎ নেই আমার কাছে। মিছির!"

মিছির ঠাকুর আসিল এবং হুকুম পাইয়া মোড়ের সন্দেশের দোকানে চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার পর মেসসুদ্ধ লোক নবজাতার কল্যাণ-কামনা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নিজ নিজ কামরায় প্রস্থান করিলেন। রামহরিবাবু তখন চিঠিখানা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলেন—মেয়ের রং ফর্সা, তবে একটু ট্যারা।"

রামহরিবাবু শ্যামা মুদীর গলির স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচারিণী সভার সদস্য ছিলেন—এ সংবাদে দমিলেন না—হাসিয়া কহিলেন, "তা হোক! গুণে সব ঢাক্‌বে। লেখা-পড়া গান-বাজনাতে এমন তালিম ক'রে তুল্‌ব মেয়েকে—" ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া বৌবাজারের একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ছোট সেতারের কত দাম পড়িতে পারে সেটাসুদ্ধ তখনই জানিয়া আসিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ছাড়া আর একটি লক্ষ্য রামহরিবাবুর ছিল, সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত। আইন পাস করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় বার-তিনেক বিয়ে ফেল করিয়া স্বগ্রাম তেঁতুলিয়া হাইস্কুলে থার্ডমাষ্টারীতে ভর্ত্তি হইলেন। মাসিক বেতন ত্রিশ টাকার সিকিপরিমাণ কন্যার শিক্ষার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ করিলেন, কিন্তু রামহরিবাবুকে আদর্শভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। প্রথম প্রথম রঙীন ছবির বই, ক্রমে ক্রমে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম ও একটি ছোট সেতার সমস্তই কন্যাকে যোগাইলেন।

গৃহিণী রুখিয়া কহিলেন, "ও ছাইপাঁশগুলো দিয়ে হবে কি? তার চেয়ে—"

রামহরিবাবু কহিলেন, "সে ভাবনা আমার আছে।"

গৃহিণী অতঃপর আর কিছু কহিলেন না।

বারো বৎসর বয়সের বীণা সেতার বাজায়; রামহরিবাবু চক্ষু মুদিয়া শোনেন, আর গৃহিণী রন্ধনশালায় ডাল সিদ্ধ করিতে বসিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতে থাকেন। ভাবিতে ভাবিতেই বীণার বয়স তেরোর কোটায় গিয়া পৌছিল। গৃহিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার মাতামহের শ্বশুর বংশ পুরুষানুক্রমে পণ্ডিত, সে ছোঁয়াচ গৃহিণীরও লাগিয়াছিল; একদিন

স্পষ্টই রামহরিবাবুকে কহিলেন, "এইবার মেয়ে পার করবার ব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে থাকতে আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দা নরকে পচ্‌বে!"

রামহরিবাবু শুদ্ধ কহিলেন, "সে হবে।" কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা দেখা গেল না।

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রামহরিবাবুকে অনেক কহিয়া দিনকয়েকের ছুটি লওয়াইয়া পাত্রের সন্ধানে পাঠাইলেন।

রামহরিবাবু সতেরো জায়গা ঘুরিয়া বাড়ী আসিয়া পাত্রমণ্ডলীর নাম-ধাম গাঁই-গোত্র ও সেই সঙ্গে কন্যা-গ্রহণের পারিশ্রমিকের অঙ্ক সমস্ত এক তালিকাভুক্ত করিয়া গৃহিণীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যা হয় কর।"

গৃহিণী মেয়ে দেখার দিন স্থির করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।

মঙ্গলাহাটীর ভট্‌চাজ বাড়ী হইতে পাত্রের মাতুল আসিয়া কন্যার বিশেষ প্রশংসা করিয়া জলযোগান্তে ফিরিয়া গেলেন; বাড়ী গিয়া মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পত্র দিলেন। শিবতলার রায়-বাড়ীর লোক মেয়ে দেখিয়া গেল। পাকা কথা হইল না। বাঁশকুড়ুলের চৌধুরী-বাড়ী হইতে পাত্র স্বয়ং বন্ধুবান্ধবসহ দেখিতে আসিল; বাজনা শুনিয়া মৃদুস্বরে একটু বাহবাও দিয়া গেল। রামহরিবাবু গোপনে পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী তা হ'লে—"

ছেলেটি বিনয়ী। মাথা নীচু করিয়া কহিল, "আজ্ঞে মা সব আপনাকে লিখবেন। আমি ফিরে গিয়েই তাঁকে বল্‌ব।"

এইরূপে রামহরিবাবু কিছুদিনের মত গৃহিণীর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইলেন। এদিকে গৃহিণী দিনকয়েক তাঁহার ভবিষ্য-জামাতৃ-

বর্গের অভিভাবকগণের পত্রের প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর জোড়া পোষ্টকার্ড লেখা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে জবাব আসিতে লাগিল। মঙ্গলাহাটীর পাত্রের পিতার অসুখ, শিবতলার পাত্রের পরীক্ষার বৎসর, ইত্যাদি। বাঁশকুড়ুল হইতে যে পত্রখানি আসিল সেটা একটু স্পষ্ট। পাত্রের মাতা লিখিয়াছেন, কন্যাটি ট্যারা—ছেলের পছন্দ হয় নাই।

পত্র পাইয়া গৃহিণী ক্ষেপিয়া উঠিলেন ; চিঠিখানা হাতে করিয়া যেখানে রামহরিবাবু বসিয়া বীণার সেতার বাজনা শুনিতেছিলেন, সেখানে গিয়াই উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কেমন হ'ল তো! গুণে সব ঢাক্‌বে না! দেখ!" বলিয়া রামহরিবাবুর নাকের ডগায় চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "যে রূপের ছিরি, তার আবার গান-বাজনা। যা ঘুঁটে দিগে যা!"

বীণা সেতার রাখিয়া নীরবে উঠিয়া গেল।

ইহার পর পিতা ও মাতার কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা বীণা শুনিতে পাইল না, কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়া মাতা অবিরত বলিতে লাগিলেন, "আহা রূপ! চোখ নয় ত নাটার বিচি!"

মাতা দ্বিপ্রহরে ঘুমাইতেছিলেন, সেই অবসরে বীণা আরশী লইয়া বসিল। এতদিন চোখে পড়ে নাই আজ দেখিল বাস্তবিকই ডান চোখটা অত্যন্ত ট্যারা। নিজের মুখ আরশীতে দেখিতে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। নানা রকম আরশী ধরিয়া দেখিল ; কোনো দিক হইতেই মুখখানিকে সুশ্রী দেখা গেল না। তখন আরশী ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বেচারী বসিয়া

রহিল। সেইদিন হইতেই বীণার বয়স যেন সহসা বাড়িয়া গেল। পিতা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন ডাকিলেন, তখন সে তাড়াতাড়ি জলের ঘটী লইয়া আসিল বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। রামহরিবাবু কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। কথা কহিলেন না। এদিকে গৃহিণীর পিতৃপুরুষকে নরকের দিকে আরও কয়েক পা অগ্রসর করাইয়া দিয়া আরও দু'টি বৎসর চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে বীণার প্রকৃতিতে একটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। সে মুখ নীচু করিয়া কথা বলা আরম্ভ করিল। বাধ্য হইয়া কখনও মুখ তুলিতে গেলে চোখের পাতা আপনা হইতেই মুদিয়া আসে—পাছে কেহ ট্যারা চোখটি দেখিয়া ফেলে! রামহরিবাবুর অবসর ছিল না; ছুটি হইলেই গৃহিণীর তাগিদে সম্ভব-অসম্ভব পাত্রের সন্ধানে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেন। ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই স্কুলের কাজ। সাহস করিয়া আর বীণার বাজনা শুনিতেও চাহিতেন না। সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীও ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেন। বীণাও সেতার ফেলিয়া উঠিয়া যাইত। মাঝে মাঝে সম্ভাবিত কোনও পাত্র আসিলে সেদিন আর বীণার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। তাহার চোখের সহিত নাটার বিচি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় গোলাকার বস্তুর তুলনা চলিতে থাকিত এবং কোনও মতে বিদায় হইয়া গেলেই যে পিতামাতার পিতৃপুরুষ নরক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহাও বীণা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিত।

সেদিন গৃহিণীর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। প্রভাতে নূতন একটি পাত্রের অভিভাবক মেয়ে দেখিয়া যাইবার সময় স্পষ্ট ভাষায় মেয়ে না-পছন্দ করিয়া গিয়াছেন। হেতু মেয়েটি ট্যারা। রীতি অনুযায়ী বীণার লাঞ্ছনার অবধি রহিল না। সমস্ত দিন না খাইয়া বীণা বিছানায় পড়িয়া রহিল; রামহরিবাবু স্কুল হইতে ফিরিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। এদিকে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই বাড়িতেছিল। ঠিক এমনি সময় অঙ্গনে নূতন একটি লোকের আবির্ভাব হইল; আগন্তুককে দেখিয়াই গৃহিণীর স্বর অকস্মাৎ খাদে নামিয়া আসিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এস বাবা, এস! কতদিন দেখিনি তোমাকে, ভাল ছিলে তো?"

আগন্তুক গৃহিণীর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, "এক রকম ছিলাম মাসী-মা, আপনারা আছেন কেমন? মাষ্টার-মশাই কোথা?"

রামহরিবাবু গলার আওয়াজ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, "কে, সুকুমার! এস, বস এইখানটায়। তাই ভাবছিলাম গরমের ছুটিটা গেল এলে না! সহরে গিয়ে ভুলেই গেলে বুঝি আমাদের?"

সুকুমার বাবরী একটু ঝাঁকাইয়া কহিল, "ভুলতে পারি আপনাদের মাষ্টার-মশাই! যে স্নেহ-মমতা পেয়েছি আপনাদের কাছে, তা কি ভুল্‌বার! বীণা কই? আছে কেমন সে?"

রামহরিবাবু না ডাকিতেই বীণা ধীরে ধীরে আসিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। রামহরিবাবু নানা বিষয়ে কন্যাকে শিক্ষা দিতেছিলেন, সুকুমার জানিত।

কুশল প্রশ্নের পর সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি শিখছ বীণা ?"

বীণা মৃদুস্বরে কহিল, "সেতার শিখ্‌ছি—"

সুকুমার উৎসাহিত হইয়া কহিল, "দুর্ভাগা দেশ ! ঘরে ঘরে যদি তোমার মত বীণা জন্মাতো তবে—"

কথাগুলি বীণার বড় মিষ্ট লাগিল। সমস্ত দিন তিরস্কার শোনার পর সুকুমারের এই স্নিগ্ধ কথা কয়টি শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিছুকাল নানা কথার পর সুকুমার উঠিয়া গেল এবং যাইবার সময় বীণাকে উদ্দেশ করিয়া কহিয়া গেল যে, কাল বৈকালে সে সেতার শুনিতে আসিবে।

৩

পাশের গ্রামের তালুকদারের একমাত্র পুত্র স্থকুমার। যখন তেঁতুলিয়া স্কুলে সে পড়িত, তখন রামহরিবাবুর বাড়ীতে সে একরূপ প্রত্যহের অতিথি ছিল। তাহার পর পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলেই সে রামহরিবাবুর সহিত দেখা করিয়া যাইত।

গত বৎসর দেশে আসে নাই ; দেশের ঘুমন্ত 'অন্তরলক্ষ্মী'কে জাগাইবার জন্ত জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া 'জাগ্রৎ যৌবন-সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়িয়াছিল ; তাহারই কাজে সে ব্যস্ত ছিল। এই সমিতিরই স্থানীয় একটি শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি দেশে আসিয়াছে।

পরদিন যথাসময়ে স্থকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বগলে 'জাগ্রৎ যৌবন-সমিতি'র একগাদা ছাপা ইস্তাহার। স্থকুমার বসিতেই রামহরিবাবু নিজের দুঃখ-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, প্রসঙ্গের মূল-বিষয় বীণার বিবাহ। বিবাহের প্রসঙ্গ, সেইসঙ্গে রামহরিবাবুর মুখে কন্যার গুণ-ব্যাখ্যান শুনিতেই বীণার মা আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রূপেই যে সব গুণ খেয়েছে! তুমি ত বাবা কলকাতায় থাক, একটা যেমন-তেমন দেখে-শুনে মেয়েটাকে পার করে দাও!"

সুকুমার কহিল, "সে কি মাসী-মা! যেমন-তেমন ছেলে কি হবে? তবে ওর যোগ্য ছেলে আমি দেখব, আপনি ব্যস্ত হবেন না"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় কহিয়া গেলেন, "ওর যোগ্য ছেলে ত্রিভুবনে জন্মায় নি। অমন ডানাকাটা পরী—"

রামহরিবাবু কহিলেন, "শুনছ! গঞ্জনা শুনে শুনে মেয়েটা একেবারে মুষড়ে গেল! এখন লজ্জায় কারও সাম্‌নে বেরোতেই চায় না। তুমি একটু ডেকে—"

"আচ্ছা, তা করব। বীণা কই?" সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

রামহরিবাবু ডাকিলেন, বীণা তাহার পড়ার ঘরে বসিয়া আহ্বানেরই অপেক্ষা করিতেছিল, ধীরে ধীরে একখানা বই হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামহরিবাবু কহিলেন, "সুকুমারকে একটু বাজনা শুনিয়ে দে।"

বাজনা শুনিয়া সুকুমার অবাক হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাজনা কে শিখাল বীণা?"

বীণা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "নিজেই শিখেছি।"

রামহরিবাবু কহিলেন, "মাষ্টার রাখবার পয়সা কোথায় বাবা? তা নইলে ইচ্ছা ছিল মেয়েটাকে ইংরেজী আর সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সব চল্‌তি ভাষা একটু একটু শেখাই। তা জান তো উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে—"

সুকুমার কহিল, "আমি বাজনা শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছি মাষ্টার-মশাই! ভাবছি শুধু শিক্ষার সুযোগ থাক্‌লে বীণা কি হ'তে পারত"

কথা শুনিয়া বীণা তাহার পড়ার ঘরে ঢুকিল। সুকুমার

একবার অপাঙ্গে তরুণীর দিকে চাহিয়া হতভাগ্য দেশের মুক্তির জন্য বীণার ন্যায় নারীর সাহায্য কতখানি প্রয়োজন, তাহা পল্লবিত-ভাষায় উচ্ছ্বাসের সহিত কহিয়া গেল।

রামহরিবাবু শুনিয়া সুকুমারের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "দীর্ঘজীবি হও বাবা, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

পড়ার ঘরে দরজার আড়ালে বীণা দাঁড়াইয়া ছিল; সুকুমারের কথাগুলিতে সে যেন এক নূতন জগতের আহ্বান শুনিল, তাহার সমস্ত মন আনন্দে ও ভরসায় সজীব হইয়া উঠিল।

বীণাকে দেশ-বিদেশের নারী-প্রগতির কাহিনী শুনাইতে রামহরিবাবু সুকুমারকে বলিয়াছিলেন। সুকুমার প্রত্যহ নিয়মিত আসিত এবং তাহার সমিতির উদ্দেশ্য নারী পুরুষের অধিকার প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া বীণার অন্তর-লক্ষ্মীকে জাগাইবার চেষ্টা করিত। বীণা কতক বুঝিত, কতক বুঝিত না; যে-কথা বুঝিত না তাহাও তাহার ভাল লাগিত। সুকুমারের কথা শোনা নেশার মত ক্রমে ক্রমে তাহাকে পাইয়া বসিল। সেদিন কি কারণে সুকুমারের আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, বীণার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। এমন সময় সুকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত দেরি হ'ল কেন?" কথার সুরে অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল, সুকুমার বুঝিল।

বীণার চিবুক ধরিয়া কহিল, "আমি না আস্‌লে কষ্ট হয় তোমার বীণা?"

বীণা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "হ্যাঁ।"

সুকুমার মৃদু হাসিল, তাহার পরে বীণার দুই কাঁধের ওপর হাত রাখিয়া কহিল, "আর আমি দেরি ক'রে আসব না বীণা ; কিন্তু তোমাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে, বল রাখবে ?"

বীণা কহিল, "রাখব। কি কথা ?"

সুকুমার কহিল, "আমাকে 'তুমি' ব'লে ডাকতে হবে, 'আপনি বলতে পারবে না।"

বীণা সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "সে আমি পারব না, আমার লজ্জা করবে।"

কিন্তু বীণার লজ্জা বেশীক্ষণ রহিল না, সুকুমার সেইদিনই বীণাকে 'তুমি' বলাইয়া ছাড়িল।

সেদিন বীণার মনে হইল সুকুমার বড় আপনার হইয়া গিয়াছে। পড়ার ঘরে বসিয়া সুকুমারের মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্রমাগতই বীণা তাহাকে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন বীণা ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্নে দেখিল, সুকুমার তাহার হাত ধরিয়া এক নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে।

ক্রমে সুকুমারের ছুটি ফুরাইল, বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল বীণা কাঁদিতেছে।

"কাঁদছ কেন বীণা ?" সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

"তুমি চলে যাচ্ছ যে !" বীণা অতি মৃদুস্বরে কহিল।

"সামনের ছুটিতেই আবার আসব বীণা, তুমি কেঁদো না।" বলিয়া সুকুমার রুমাল বাহির করিয়া বীণার চোখের জল মুছাইয়া দিল।

বীণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুকুমারের ডান হাতখানি দুই হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে ঘৃণা করবে না বল।"

সুকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ঘৃণা কেন তোমাকে কর্‌ব বীণা? কি করেছ তুমি?"

বীণা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মুখ নীচু করিয়াই কহিল, "আমি যে ট্যারা, আমাকে—" বলিয়াই বীণা আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

সুকুরের ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুকের মৃদু-হাস্য খেলিয়া গেল, পর মুহূর্ত্তেই বীণার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া সে কহিল, "তুমি ট্যারা বলেই তো আরও বেশী করে তোমায় ভাল লাগে বীণা!"

কথা শুনিয়া বীণার মুখে হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিল।

যাইবার সময়ে গৃহিণী সুকুমারকে একটি পাত্র দেখিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। রামহরিবাবু সুকুমারের সম্মুখেই কহিলেন, "তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, সুকুমার যখন কথা দিয়েছে, তখন কাজ কর্বেই। ওরা অসাধ্য-সাধন করতে পারে।"

সুকুমার চলিয়া যাইবার পর হইতেই বীণা যেন একটা স্বতন্ত্র মানুষে রূপান্তরিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে মায়ের ভৎর্সনা শুনিয়া পিতার কাছে মাঝে মাঝে সে নালিশ করিত, আজকাল গালাগালি শুনিলে পড়ার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করে।

জবাব না পাইলে গৃহিণীর বকুনী ভাল জমিত না। ক্রমাগত বকিতে না পারিলে উত্তেজনায় তাঁহার মাথা ধরিত, কাজেই একদিন বীণার অকারণ ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া তিনি রামহরিবাবুকে বলিলেন, "ওগো শুন্ছ? মেয়ের যে আর একটা গুণ বাড়্ল। ছিল ট্যারা, হ'ল বোবা। গালাগাল দিলেও কথা বলে না আর।"

রামহরিবাবু বীণার এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, হেতুও প্রায় অনুমান করিয়াছিলেন; সেই সঙ্গে কয়েক দিন হইতে কন্যার একটা চমৎকার দাম্পত্য-জীবনের চিত্র তাঁহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল; তিনি গৃহিণীর অভিযোগের উত্তরে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "মেয়ে বড় হ'য়েছে, এখন আর রূপের খোঁটা দিও না। তোমার অদৃষ্টে ভাল জামাই আছে, ব'লে দিচ্ছি।"

গৃহিণীর হঠাৎ রামহরিবাবুর কথা কয়টি কেন যেন অত্যন্ত ভাল লাগিল, বলিলেন, "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

রামহরিবাবু আশ্চর্য্য হইলেন, গত তিন বৎসর মধ্যে গৃহিণীর

মুখে এমন মধুর কথা তিনি শোনেন নাই ; নিবন্ত কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া তিনি প্রাণপণে ক্রমাগত টানিতে লাগিলেন।

সুকুমার নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা কয়েকখানা খাম রাখিয়া গিয়াছিল। আদেশ ছিল, বীণা যেন সপ্তাহে দু'খানি করিয়া চিঠি লেখে।

কয়েক দিন তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া সেদিন বীণা সুকুমারকে চিঠি লিখিতে বসিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া বীণা চিঠি লিখিল এবং চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া বীণার মন অনেকটা লঘু হইয়া গেল।

টেবিলের উপরে বড় আয়না রাখিয়া সুকুমার মুখে 'স্নো' মাখিতেছিল। তাহার চৌকীতে বসিয়া তাহাদের সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নৃপেন দত্ত একখানি বৃহদাকার ডিকসনারী বাজাইয়া গজল গাহিতেছিল। এই সময় দারোয়ান ডাকের চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল।

নৃপেন চিঠির উপরে চোখ বুলাইয়া কহিল, "এ কি হে সুকুমার, তোমারই হাতের লেখা ঠিকানা দেখছি যে।"

কাহার চিঠি সুকুমার বুঝিল। তাড়াতাড়ি 'স্নো'র শিশিটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া হাত বাড়াইল।

নৃপেন চিঠিখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "কার চিঠি আগে বল!"

সুকুমার কহিল, "দাও আগে পড়ে নি, তারপর দেখাব।"

বলা বাহুল্য, চিঠিখানি বীণার। সুদীর্ঘ পত্র। সুকুমার একবার চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া মুখে 'স্নো' মাখিতে মাখিতে বলিল, "তুমি একবার ভাল ক'রে জোরে পড় নৃপেন, আমি শুনছি।"

নৃপেন পড়িল।

বীণা লিখিয়াছে—

"তুমি চলিয়া গিয়াছ, আমার কিছু ভালো লাগিতেছে না। লেখাপড়া করিতে ইচ্ছা করে না, তুমি রাগ করিবে বলিয়া জোর করিয়া পড়িতে বসি।

যে পথ দিয়া তুমি আসিতে, সেই পথের দিকে জানলা দিয়া চাহিয়া থাকি, তুমি শীঘ্র আসিবে। না আসিলে লেখাপড়া সমস্ত ভুলিয়া যাইব, ইত্যাদি।"

এইকথা-কয়টিই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বীণা পাঁচ পাতা চিঠি লিখিয়াছে।

নৃপেন চিঠি পড়িয়া কহিল, "খুব গেঁথেছ যা হোক! কে ইনি?"

সুকুমার তোয়ালে দিয়া মুখ ঘষিতে ঘষিতে কহিল, "সে খবর এখন শুনো না। চিঠিটা দাও দেখি, চট্‌পট্ একটা জবাব লিখে দিই।"

"শেষটা কি হয় একবার জানিয়ো ভাই।" বলিয়া চিঠি রাখিয়া নৃপেন সুকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুকুমারকে চিঠি পাঠাইবার পর হইতে কেবলই বীণার মনে হইয়াছে যাহা লিখিবার ছিল তাহা লেখা হয় নাই। নিজের এই ত্রুটিতে ক্রমাগতই সে লজ্জিত হইতেছিল। ভাবিতেছিল, সুকুমার হয়ত রাগ করিবে এবং চিঠির জবাবই দিবে না, কিন্তু যথারীতি জবাব আসিল। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বার-বার বীণা চিঠিখানা পড়িল। উৎসবের বাঁশীর সুরের মত চিঠির কথাগুলি তাহার কানের মধ্যে সমস্ত দিন ঝঙ্কার দিতে লাগিল।

চিঠিতে অনেক কথাই ছিল ; প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সুকুমারের মন উদাস হইয়া যায় ; পড়িতে বসিলে একজনের স্নিগ্ধ-আঁখি বহির পাতায় ভাসিয়া ওঠে, তাহারই হাতের সেলাই রুমালখানা বুক পকেটে নীরব-গুঞ্জরণে গান গাহিতে থাকে। সুকুমারের এই প্রকার মারাত্মক অবস্থার বর্ণনায় চিঠিখানার আদ্যোপান্ত পূর্ণ ছিল, শেষের দিকে গুটিকয়েক উপদেশও ছিল।

সন্ধ্যায় চিঠিখানা বাক্সে তুলিয়া রাখিবার পূর্ব্বে তাহার উপরে মাথা রাখিয়া বীণা আপন-মনে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার উপযুক্ত হতে পারি।"

রামহরিবাবুর সেদিনকার কথা গৃহিণীর মনে ছিল ; এ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা তিনি করেন নাই। কাজেই স্বামীর তাম্রকূট-সেবন ও কন্যার সঙ্গীত-চর্চ্চা একপ্রকার অব্যাহতই চলিতেছিল, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি আবার সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন। সুকুমারের বীণার নিকট চিঠি লেখা, রামহরিবাবু তাহা জানিতেন। কহিলেন, "সুকুমার ঠিক করবে বলে গেছে। দেখ তো—"

গৃহিণী অবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, "হ্যাঁঃ, তার আবার সে কথা মনে আছে! বড়মানুষের ছেলে—গরীবের কথা ভাব্‌তে দায় পড়েছে তার।"

বীণা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, মায়ের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিল।

রামহরিবাবু চশমা জোড়া মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "দেখ তো

আর মাসখানেক, সে তো সামনের ছুটিতেই আসছে, বোঝা-পড়া তার সঙ্গেই কোরো।" বলিয়াই পরম নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

সুকুমার পাত্র স্থির করিয়া দিবে এ সম্বন্ধে গৃহিণীর সন্দেহমাত্র ছিল না, সে শীঘ্রই আসিতেছে শুনিয়া তিনি খুশী হইয়া চলিয়া গেলেন।

বড়দিনের ছুটিতে সুকুমারের আসিবার কথা। পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন সম্বলিত একখানি পকেট-পঞ্জিকা জোগাড় করিয়া বীণা— প্রত্যহ বড়দিনের তারিখ দেখিত। দিনগুলি অতি মন্থর-গতিতে কাটিতেছিল। ক্রমে বড়দিন আসিল। সেই সঙ্গে সুকুমার আসিল। সন্ধ্যায় সুকুমারের সহিত বীণার সাক্ষাৎ হইল।

সুকুমারের বুকে মুখ রাখিয়া বীণা কহিল, "তুমি বাবাকে বোলো, আমি কল্‌কাতায় পড়ব। তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না।"

সুকুমার কহিল, "তোমার বাবার যদি মত না হয়?"

বীণা মুখ তুলিয়া কহিল, "আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যেয়ো।"

সুকুমার মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা আগে ইস্কুল ঠিক করি, তারপর জিজ্ঞেস্ করব।"

গৃহিণী প্রত্যহই সঙ্কল্প করেন, বীণার পাত্রের কথা সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু অবকাশ হয় না। বিশেষ রামহরিবাবু পত্নীকে বলিয়াছিলেন, সুকুমার নিজে বীণার বিবাহের প্রসঙ্গ না তুলিলে তিনি যেন সুকুমারকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। দিনকয়েক গৃহিণী

স্বামীর আদেশ অতি কষ্টে পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বদিন যখন সুকুমার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে গেল, গৃহিণীর আর ধৈর্য্য রহিল না। সুকুমার কবে ফিরিবে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি বীণার বিবাহের প্রসঙ্গ পাড়িলেন।

সুকুমার কহিল, "তার এত তাড়াতাড়ি কিসের মাসী-মা! লেখাপড়া শিখুক!"

গৃহিণী কহিলেন, "তাড়াতাড়ি কিসের বলিস্ নে বাছা, আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছরে—"

এ কথা সুকুমার পূর্ব্বেও শুনিয়াছে, জানিত গৃহিণীর নিজের বিবাহের কাহিনী অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের পূর্ব্বে শেষ হইবে না। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সুকুমার কহিল, "পাত্র এক রকম দেখেই রেখেছি মাসী-মা, ব্যস্ত হবেন না। সামনের পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ঠিক করব।" বলিয়া সে আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহিণী ঘরের মধ্যে হইতেই কহিলেন, "পাস-ফাশে কাজ নেই বাবা, যেমন-তেমন একটা দেখে-শুনে—"

সুকুমার যাইতে যাইতে জবাব দিল, "বীণাকে যদি ফেলে দিতেই হয় মাসী-মা, তবে না হয় আমাকেই—দেবেন।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। কথা কয়টি সুকুমার খেয়ালের মুখেই কহিয়া গেল এবং কি কহিল পথে যাইতে তাহা চিন্তাও করিল না। অথচ এই কথায় রামহরিবাবুর ক্ষুদ্র গৃহস্থালী তুমুল আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

গৃহিণী ব্যঞ্জনের কড়াইটা ধুপ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া খুন্তি

হাতে করিয়াই রামহরিবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হাঁগা! সুকুমার যেন কি ব'লে গেল।"

রামহরিবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না, গলাটা অত্যন্ত ধরিয়া আসিয়াছিল, বার-দুই কাসিয়া কহিলেন, "শুনতে তো পেলে! আমি আর—"

গৃহিণী থুতিথানা রামহরিবাবুর গালে ঠেকাইয়া আদর করিয়া কহিলেন, "বলই না শুনি, আমার যে গা কেমন-কেমন করছে।"

রামহরিবাবু বলিলেন, "বললে যে মেয়ে ফেলে দিতে হ'লে তাকেই দিতে। এখন যাও জল আন, মুখটা তো এঁটো করে দিয়েছ।"

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বীণা সুকুমারের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হয় নাই। বিধাতার চোখে সে যে সুকুমারেরই স্ত্রী এ কথা সুকুমারের মুখেই সে সহস্রবার শুনিয়াছে, কিন্তু সকলের সম্মুখে সুকুমার এই কথা কহিয়া গেল দেখিয়া তাহার আর লজ্জার পরিসীমা রহিল না। সে-রাত্রে আর সে কাহারও সম্মুখে বাহির হইল না, থাইতে ডাকিলেও উঠিল না।

রামহরিবাবু কহিলেন, "থাক্, ডেকো না—লজ্জা পেয়েছে!"

সেদিন রাত্রে মৃদুগুঞ্জনে স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শ চলিল এবং দিন-দুই পর একদিন পাঁজি দেখিয়া রামহরিবাবু সুকুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুকুমারের বিবাহের কথা পাড়িতেই তাহার পিতা ব্রজদুলালবাবু কহিলেন, "ছেলের বিয়েতে

আমার কোনো হাত নেই। ছেলের মত হ'লেই হ'ল। জানেন ত আজকালকার ছেলে।"

কথা শুনিয়া রামহরিবাবু আশ্বস্ত হইলেন এবং অনেক বিনীত অনুরোধ সহকারে সুকুমারের পিতাকে কন্যা দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ব্রাজদুলালবাবু মুখে বলিলেন না, রামহরিবাবু চলিয়া গেলে অন্তঃপুরে যাইয়া সুকুমারের মাতাকে সমস্ত কহিতেই তিনি দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, "ওমা! সে কি কথা! রামহরি মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে!" তাঁহার আর কথা যোগাইল না।

ব্রজদুলালবাবুর সাংসারিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রখর ছিল। রামহরিবাবুর পরিবারের সহিত সুকুমারের হৃদ্যতা ছিল একথা তিনি জানিতেন। সুকুমারের মাতাকেও তাহা জানাইয়া দিলেন। সুকুমারের মাতা সকল কথাগুলি শুনিয়া পাত্রী দেখিতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। কিন্তু সমস্ত দিন মুখ ভার করিয়া রহিলেন।

বীণা নিবিষ্ট হইয়া সুকুমারকে একখানি পত্র লিখিতেছিল; মাতা আসিয়া কহিলেন, "লেখাপড়া থাক্ না আজ, সাবান মেখে স্নান করে নে। তোকে দেখ্‌তে আসবে।"

কিছুদিন হইতে বীণা নির্ভয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলিত; চিঠির কাগজখানি উল্টাইয়া রাখিয়া কহিল, "আমাকে কি কেউ কোনো দিন দেখেনি মা, যে নতুন করে দেখতে আস্‌বে?"

কথার ঝোঁকটা কাহার উপর গিয়া পড়িল, গৃহিণী তাহা বুঝিলেন; বীণাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কহিলেন, "নে মা,

আজ এই একটা দিন ছাড়া আর তোকে বল্‌ব না, ওঠ! বাপেরও তো পছন্দ চাই—"

বীণা গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ব্রজদুলালবাবু সুকুমারের মাতুলের সঙ্গে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। বীণা ধীরে ধীরে আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। ইতিপূর্ব্বে কাহারও সম্মুখে আসিতে এত ভয় তাহার কোনো দিন হয় নাই। কেবলই মনে হইতেছিল যদি পছন্দ না হয়। এতদিন পরে আবার ট্যারা-চোখটা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন হইয়া পড়িল। সুকুমারের পিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সে দেখিয়াছিল, ডান-চোখের তারাটিকে ঠিক্‌ চোখের মাঝখানে আনিবার জন্য সে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল এবং এই অসম্ভব প্রয়াসে তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রজদুলালবাবু বীণার অবস্থা বুঝিলেন, কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া একটা মৃদু আশীর্ব্বচনের সঙ্গে তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

বীণা চলিয়া গেলে রামহরিবাবুর সহিত সুকুমারের মাতুলের যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহারা মেয়ে দেখানো নিয়ম রক্ষা করিতে আসিয়াছেন মাত্র—বিবাহ-বিষয়ে ছেলের মতই চরম এবং তাহাকে শীঘ্রই লেখা হইবে। ঘরের পিছনে বীণা দাঁড়াইয়া শুনিল এবং এই কথায় তাহার বুকের দুর্ভাবনার বোঝা নামিয়া গেল।

সেদিন দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত লিখিয়া বীণা অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করিল। সুকুমারের পিতা আসিয়া যে তাহাকে দেখিয়া গিয়াছেন, সে-কথার উল্লেখ করিতেও ভুলিল না।

৬

সেদিন সুকুমারের অবকাশ আদৌ ছিল না। সন্ধ্যায় তাহাদের সমিতিতে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল সুকুমার তাহাই লিখিতেছিল এবং নৃপেন দত্ত ষ্টোভ ধরাইতেছিল। এই সময়ে ডাকের চিঠি আসিল। বীণার চিঠিখানা খুলিয়া সুকুমার পড়িতে বসিল। সমস্তই পুরাতন কথা। সেই ভাল না-লাগা, দিবারাত্রি অস্বস্তিবোধ—প্রতি সন্ধ্যায় চোখের জল ফেলা—সুকুমার পাতাগুলি একবার উল্‌টাইয়া গেল। চিঠির শেষের দিকে একটা কথা ছিল, পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইল, বীণা লিখিয়াছে, "শ্বশুর আমাকে দেখিয়া গিয়াছেন।" সেই সঙ্গেই আর একছত্রে লেখা আছে, "বলিয়াছেন তোমার মতেই তাঁহাদের মত।"

চিঠিখানা ফেলিয়া রাখিয়া দ্বিতীয় পত্র পড়িতেই সুকুমারের মন খারাপ হইবার উপক্রম হইল। চিঠিখানা তাহার মায়ের। সে-চিঠিতে রামহরিবাবুর সহিত তাহার পিতার সাক্ষাতের কথা এবং রামহরিবাবুর অনুরোধে তাঁহার কন্যাকে দেখার বিশদ-বিবরণ লেখা ছিল। তৃতীয় পত্র রামহরিবাবুর। তিনি লিখিয়াছেন যে, সুকুমারের কথাতে ভরসা পাইয়া তিনি ব্রজদুলালবাবুকে কন্যা দেখাইয়াছেন। যে মাসে তাহার পড়াশুনার বিঘ্ন না হয় সেই মাসেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা। সুকুমারের পত্র পাইলেই ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই সুকুমার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল 'ননসেন্স'।

নৃপেন দত্তের হাত হইতে ডিমের প্লেট পড়িয়া গেল, সে কহিয়া উঠিল, "ব্যাপার কিহে সুকুমার!"

কতকগুলি ইংরেজী ভাষায় গালাগালি বকিতে বকিতে সুকুমার চিঠি তিনখানা মুঠা করিয়া নৃপেন দত্তের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

নৃপেন ধীরভাবে চিঠিগুলি পড়িয়া কহিল, "এতদূর এগিয়েছ যখন—"

সুকুমার রুখিয়া উঠিল, কহিল, "কি বল্‌ছ বিয়ে কর্‌ব!"

নৃপেন মুচ্‌কিয়া হাসিয়া কহিল, "অগত্যা! তা নইলে গায়ে কাদা মাখ্‌লে কেন, বল?"

সুকুমার রুক্ষস্বরে কহিল, "দোষ কার? ফড়িং আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পাখ্‌না পুড়িয়েছে, দোষ কি আগুনের? বেশ বল্‌চ? তুমি আমার হ'য়ে মাকে চিঠি লিখে দাও আমি বলে যাচ্ছি।"

নৃপেন দত্ত কহিল, "ও-সব ক'রো না সুকুমার! তার চেয়ে 'অশ্বত্থামা হত ইতি' ক'রে একটা চিঠি লিখে পশ্চিমে বেরিয়ে পড়। আস্তে আস্তে বেচারী সব ভুলে যাবে।"

সুকুমার কহিল, "তুমি জান না তাকে, হয়ত বাপের সঙ্গে এসেই পড়বে। সে এক কেলেঙ্কারী! মুখ দেখাতে পারব না! তার চেয়ে যা বল্‌ছি তা-ই কর। ছেঁড়া নেকড়ার আগুন নিবিয়ে দাও। আজকের মিটিংটাই মাটি হ'ল দেখ্‌ছি!" বলিয়া সুকুমার চিঠির কাগজ বাহির করিল।

নৃপেন নিজ নামে স্থকুমারের পরামর্শ মত স্থকুমারের মায়ের কাছে পত্র লিখিল। বর্ত্তমানে বিবাহের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি—শেষে রামহরিবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে আপত্তির বিচিত্র কারণ দেখাইয়া সে চিঠি শেষ করিল। মেয়েটি যে অত্যন্ত ট্যারা এ কথাটিও নৃপেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্থকুমার লিখাইয়া দিল। চিঠিখানা নিজ হাতে ডাকে পাঠাইয়া স্থকুমার মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বাঁচ্‌লাম হে! বড়ই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল!"

নৃপেন দত্তের চিঠি পড়িয়া স্থকুমারের মাতা ব্রজদুলালবাবুকে সগর্ব্বে কহিলেন, "দেখ্‌লে তো! তেমন ছেলেই গর্ত্তে ধরিনি। দাও পাঠিয়ে মাষ্টারের বাড়ী।"

ব্রজদুলাল বাধা দিয়া কহিলেন, "ছিঃ, তার চেয়ে লোক দিয়ে ব'লে পাঠাও এখন বিয়েতে ছেলের মত নেই।"

স্থকুমারের মাতা কহিলেন, "উঁহু, মাষ্টারের মেয়ে ছেলেকে তাহ'লে 'গুণ' কর্‌বে।" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন এবং নৃপেন দত্তের চিঠিখানা ক্ষান্ত দাসীর হাতে প্রাতঃকালেই যথাস্থানে রওনা হইয়া গেল।

বীণা স্থকুমারের জন্ত একটা বালিশের ওয়াড় সেলাই করিয়া তাহাতে একজোড়া গোলাপ ফুল তুলিতেছিল। এমন সময় মায়ের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহার মাতা মাটিতে মাথা খুঁড়িতেছেন, আর চীৎকার করিতেছেন, "ওরে আমার পোড়া কপাল!" দাওয়ায় শুষ্কমুখে রামহরিবাবু একটি

খুঁটি ধরিয়া বসিয়া আছেন আর ক্ষান্ত দাসী একখানা চিঠি হাতে করিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সুকুমারের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বীণা ছুটিয়া আসিয় মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া শঙ্কা-বিহ্বলস্বরে কহিল, "কি মা!"

গৃহিণী বীণাকে দূর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "দূর্ হ! কালামুখী! দূর্ হ! মুখ দেখাস্ নি আর! দেখগে যা চিঠিতে কি লিখেছে!"

বীণা ক্ষান্ত দাসীর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল।

বেলা তখন দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে, তখনও বীণা কাঠের পুতুলের মত নৃপেন দত্তের চিঠিখানা হাতে করিয়া বসিয়াছিল। তাহার যে কি হইয়াছে তাহা সে ভাবিতেও পারিতেছিল না! গত কয়েক মাসের বড়-ছোট সকল ঘটনা, সুকুমারের প্রত্যেকটা কথা মনের মধ্যে আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছিল। সকল কথার মধ্যে একটি কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল, সুকুমার বলিয়াছিল— "ট্যারা বলেই তোমাকে আরও বেশী ভাল লাগে!"

সুকুমার আজ লিখিয়াছে সে ট্যারা! ভাবিতে ভাবিতে দেয়ালে টাঙানো সুকুমারের ছবিখানার দিকে তাহার চোখ পড়িল; ভাবিল সুকুমারের সম্মুখের উঁচু দাঁত দু'টি তো তাহার চোখে কোনো দিন কুশ্রী লাগে নাই। কেবলই মনে হইয়াছে দাঁত দু'টি উঁচু না হইলে যেন মোটেই মানাইত না, কিন্তু তাহার ট্যারা চোখটি সুকুমারের চোখে বিশ্রী লাগিল কি করিয়া!

"নাও, হয়েছে! খুব চলিয়েছ এখন দু'টো গিলে নাও!" বলিয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন। ঘরে ঢুকিয়া বীণার মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বীণা মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যাকালে রামহরিবাবু ফিরিয়া অতি শুষ্কস্বরে বীণাকে ডাকিলেন, সে সাড়া দিল না। খাইবার জন্য গৃহিণী ডাকিলেন, মাথাধরার অছিলায় সে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

রামহরিবাবু শুধু কহিলেন, "ওকে আর আজ ডেকো না।"

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাগিয়া বীণা সুকুমারের চিঠিগুলি পড়িল, তারপর সুকুমারের ছবিখানার দিকে চিঠিগুলি আগাইয়া ধরিয়া কহিল, "এ-সব তা'হ'লে মিছে কথা! আমি শুধু ট্যারা!"

ট্যারা! ট্যারা! কথাটা মনে করিতেই মাথার মধ্যে তাঁহাদের কেমন ওলট-পালট হইয়া গেল। মনে হইল চোখটার সঙ্গে যেন সমস্ত দেহের কোনও সম্পর্ক নাই; ভাবিতে ভাবিতে টেবিলের উপর হইতে কখন বীণা পেন্সিল-কাটা ছুরিখানা তুলিয়া লইল।

* * * *

আর্তনাদ শুনিয়া রামহরিবাবু ও তাহার পশ্চাৎ গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, বীণার সমস্ত মুখখানা ভাসাইয়া রক্তের স্রোত

বহিতেছে আর ছুরিখানা ডান চোখের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে।

সংবাদটি যথারীতি সুকুমারের নিকট গিয়া পৌঁছিল, তবে অন্য ধরণে। তাহার মাতা লিখিয়াছেন, "ছুরির খোঁচা লাগিয়া রামহরি মাষ্টারের মেয়ের ডান-চোখটা একেবারে কাণা হইয়া গিয়াছে।"

সুকুমার দাড়ি কামানো বন্ধ রাখিয়া সংবাদপত্রপাঠে রত নৃপেন দত্তের দিকে চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "দেখ্‌লি নৃপেন, ভাগ্যিস—"

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

কল্পনাচারী মানবমন

যুগে যুগে তার জীবনে রচনা ক'রেছে স্বপ্নের জাল।

তাই তার পাওয়ার মাঝে আছে না-পাওয়ার বেদনা,

না-পাওয়ার মাঝে আছে পাওয়ার আনন্দ।

বাস্তবের নর-নারীকে সে করেছে কল্পনার বস্তু—মনের আলেখ্যকে খুঁজে পায় নি বিশুষ্ক ধরণীর বুকে—কেবল ক্ষ্যাপার মত পরশ পাথর খুঁজে খুঁজে ফিরেছে—ক্লান্তিভরে অতিক্রম ক'রে চ'লেছে পুরাতন দীর্ঘ পথ।

দেহ ও দেহাতীত-জীবনে এই মানুষের চিরন্তন জীবনেতিহাস।

দুইটি নর-নারীর জীবনের চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণ আলেখ্য।

দাম—চার টাকা

— অন্যান্য গ্রন্থসমূহ —

কারটুন ২৲ মরা নদী ৩৲

বিবস্ত্র মানব ৪৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা